1549

কবিতা

[illegible] বর্ষ, প্রথম সংখ্যা আশ্বিন-পৌষ ১৩৫৬ ক্রমিক সংখ্যা ৬৩

সম্পাদকীয়

'কবিতা' বন্ধ হ'তে-হ'তেও হ'লো না। সভাস্থল থেকে হঠাৎ অপসৃত হওয়া অশোভন, যাত্রার মুখে একটা নমস্কারের নিয়ম আছে। শুধু এই নিয়মরক্ষাটুকুই আপাতত আমাদের সংকল্প, কেননা এবার আমরা কোনোরকমে স্থগিত হ'তে পারলেও সেদিন আর পারবো না, হয়তো আগামী বছরেই বিদায় নেবো।

শীতের শেষে আশ্বিন সংখ্যা প্রায় বেমানান হ'য়ে পড়ে, তাই এ-সংখ্যার নাম দিলাম আশ্বিন-পৌষ। এর পরে চৈত্র সংখ্যা বেরোবে, বৈশাখে আর-একটি, অতএব আষাঢ়েই যথারীতি বছর পুরবে। তারপর কী হয় দেখা যাক।

'কবিতা'র এ-সংখ্যা আরম্ভ হ'লো সেই মহাকবির, মহামানবের স্মরণে, যাঁর জন্মের দ্বিশতবার্ষিকী ১৯৪৯-এ বিশ্বসাহিত্যের বড়ো ঘটনা। লন্ডনে ইংলণ্ডে আমেরিকায় এত নতুন আলোচনা হয়েছে, নতুন অনুবাদও [illegible]রিয়েছে, বেরোচ্ছে, যে গ্যেটে আধুনিক মানুষের মনে নতুন ক'রে জন্মালেন [illegible]যায়। যুদ্ধের পরে এমন শুভ ঘটনা আর ঘটেনি। এতে বোঝা গেলো যে প্রকৃতিস্থতার মহোৎসবের শেষে পৌষারির তারিখে সেই অক্লান্ত মাতার কাছে মানুষকে ফিরতে হয়, যে-মাতাপ্রকৃতির এই কবি ছিলেন আজীবন [illegible]ক। প্রবল পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের সমসাময়িক প্রকট ব্যাধিতে এই [illegible]দ্যের পরামর্শ উপকারী হ'তে পারে, অবসাদগ্রস্ত বাংলা সাহিত্যেও তাঁর [illegible] কবিসত্তাকে আমরা আহ্বান করি।

গ্যেটে

(১৭৪৯-১৮৩২)

অমলেন্দু বসু

শ্রদ্ধেয় এবং প্রীতিকর কর্মের আলোচনায় মানুষের মন স্বতই কর্মীর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে, কীর্তির চেয়ে কর্তাকে অনেকে সচরাচর মহত্তর, অন্তত মোহনতর মনে করেন, এবং চরিতকথা অবলম্বনে মন্ময় ভাষারচনায় প্রবৃত্ত হন, বিশেষত সাহিত্যালোচনার ক্ষেত্রে এ-আকর্ষণ সাধারণ ঘটনা। যেখানে জীবনী সম্বন্ধে আমাদের তথ্যের পুঁজি স্বল্প অথবা মন্ময় ভাষ্যের প্রতিকূল, সেখানে বাধ্য হয়েই পাঠক নানারকম অনুমানের আশ্রয় নেন। এহেন অনুমানপ্রধান মূল্যায়নের অন্তর্নিহিত ত্রুটি সাহিত্যালোচনায় বহুবার প্রকট হয়েছে। অপর পক্ষে অনেক সময়, বিশেষত তথ্যভূমিত, প্রচুরে-পীড়িত আধুনিক কালে, চরিতকথার পুঁজি স্ফীত হবার ফলে মূল্যায়নকারকের পক্ষে সহসা-সিদ্ধান্তের প্রলোভন যে-পরিমাণে প্রবল হয়, বিবেকী আলোচকের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় তদনুপাতেই কঠিন।

গ্যেটের জন্মের দ্বিশতবর্ষ পরে গ্যেটে-সমালোচকের এই দুরূহ দায়িত্ব অবিস্মরণীয়। গ্যেটের অসংখ্য পত্রাবলী, আত্মচরিত, তাঁর বিভিন্ন ভ্রমণকাহিনী, কোনো-কোনো সমসাময়িকের বর্ণনা, এক্কারমানের অনুকরণে একেরমান-লিখিত "গ্যেটের সঙ্গে কথোপকথন" প্রভৃতি গ্রন্থের বিপুলপরিমাণ তথ্যে সমালোচক ভারগ্রস্ত। এই তথ্যসাহচর্যের সাহায্যে হয়তো গ্যেটের কাব্য বা গদ্য আখ্যানের পাত্রপাত্রীর সঙ্গে কবিজীবনীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্ধারণ সম্ভব, হয়তো কাব্য বা আখ্যানবিশেষের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্বন্ধে, উপরন্তু তাদের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধবিচারে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা এবং অন্তরাখ্যান সম্ভব। পক্ষান্তরে, এ-ও সম্ভব যে কবিচরিতের ঔৎসুক্যকর ঘটনা-বলীতেই সমালোচকের চিত্ত নিবদ্ধ থেকে উপকরণের পরপারে রূপায়ণে পৌঁছবে না। "ডিখ্‌টুঙ্গ উণ্ড ভ্যাহ্‌র্‌হাইট" নামক আত্মচরিতে গ্যেটের প্রথম জীবনের যে-বর্ণনা পাই তার সঙ্গে হ্বিলহেল্‌ম্‌ মাইস্টারের শিক্ষানবিশীর প্রথম অংশের সাদৃশ্য প্রচুর, তবুও মাইস্টার ও গ্যেটে সম্পূর্ণ একাত্ম

এ-কথা ভাবা অসংগত। সত্য, প্রেমের-প্রণয়িণী লট্‌ শার্লট্‌ বাফ্‌-এর প্রতিচিত্রণ, কিন্তু সাহিত্যের নারী সম্পূর্ণত বাস্তবেরও, এই ভুল অন্য অনেকের সঙ্গে শার্লটের স্বামী এবং গ্যেটের বন্ধু কেস্টনারও করেছিলেন ব'লে কবির বিক্ষুব্ধ বিস্ময়ের কথাও আমরা জানি। যে-সব সমালোচক শুদ্ধ জৈবনিক ঘটনার সাহায্যে গ্যেটের (অথবা যে-কোনো কবির) শিল্পের রসগ্রহণ করতে চান; তাঁদের আনন্দ নির্মাণকর্মে, সৃষ্টিতে নয়, তাঁদের সমালোচনা অনেকাংশে পরচর্চাবৃত্তিরই উন্নত তৃপ্তিসাধন। গ্যেটের জীবন প্রণয়িণীবহুল, বার্ধক্যেও তরুণীর আকর্ষণে মজেছিলেন, তবু এই ব্যাপারকে বহুরঞ্জিত করলে সেই ভুলই করা হবে, যে-ভুলের প্ররোচনায় আমরা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-আনেৎ ভালঁর কাহিনীর প্রতিসঙ্গ খুঁজি "গিল্‌ট্‌ অ্যাণ্ড সরো" বা "ভট্রাকুর অ্যাণ্ড জুলিয়া"র প্রতি ছত্রে। যেমন মিল্টনের রাজনৈতিক কার্যকলাপের জ্ঞানে আমরা "পারাডাইস লস্ট"র অংশবিশেষের বা ছত্রবিশেষের অর্থ বুঝতে পারি মাত্র, সমগ্র কাব্যের সর্বগত প্রেরণা উপলব্ধি করতে পারি না, তেমনি, গ্যেটে-জীবনীর রাজ্যশাসনপর্বের গুরুত্ব না-ই থাকে, তার আলোকে ফাউস্টের দ্বিতীয় পর্বের বিশেষ কতগুলি রোচনার ব্যাখ্যা পেলেও কবির weltanschauung বা বিশ্বদৃষ্টি আমাদের অজ্ঞাত থেকে যায়।

এই কারণেই এই কবির জীবনীতথ্যের বহুলতা সমালোচকের পক্ষে অপলাপী প্রলোভন। গ্যেটের সমালোচনা বা জৈবনিক অনুসন্ধিৎসা দীর্ঘকাল ধ'রে সমার্থক হয়ে এসেছে, আজ তাঁর জন্মের দুই শত বৎসর পরে সে অনুসন্ধিৎসার ধূম্রজাল ছেদ করে তাঁর সাধনার সেই নাভিমূলে আমাদের পৌঁছনো দরকার যেখান থেকে তাঁর বহুবিবর্তনশীল ব্যক্তিত্বের অক্ষয় শিল্পরূপ উৎসারিত।

২

এমিল [illegible] লক্ষ্য করেছেন—ঠিকই লক্ষ্য করেছেন—যে গ্যেটের এমন কোনো-একটি বিশেষ গ্রন্থ বা কর্ম নেই যাতে তাঁর বহুব্যাপ্ত সমগ্র প্রতিভার সংহত, কেন্দ্রাসিত্ত অথচ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিচিত্রণ মেলে, যেমন মেলে দান্তে বা মিল্টনের কাব্যে। বস্তুত, এই বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রতিভার কোনোপ্রকার বিকৃতির প্রমাণ নয়। যে-ক্ষেত্রে মহৎ সাহিত্যের এবং সাহিত্যাতীত মহৎ ব্যক্তিত্বের

সাযুজ্য ঘটে—যেমন রবীন্দ্রনাথে—সেক্ষেত্রে এহেন সংহতির প্রত্যাশা বৃথা। "চরৈবেতি"—মহৎ ব্যক্তিত্ব নিয়ত চলমান, তার ঊর্ধ্বগতি কম্পুরেখ, গভীর থেকে গভীরতর তার আত্মোপলব্ধি, তার শিল্পরূপায়ণ অধিক থেকে অধিকতর সৌন্দর্যাভিসারী। যদিচ গ্যেটের কোনো একটি গ্রন্থে তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বের প্রতিরূপ মেলে না, এমনকি আপাতদৃষ্টিতে যে-কোনো দুইটি গ্রন্থ স্পষ্টত ভিন্ন-পন্থী, তবু তাঁর সমগ্র সাহিত্যের সুসংগত বিবর্তন বিস্ময়কর। "ভের্থেরের দুঃখ", "ফাউস্ট প্রথম পর্ব", "হ্বিলহেল্‌ম্ মাইস্টার", "হার্মান ও ডরাথিয়া", "ফাউস্ট দ্বিতীয় পর্ব", "পূর্ব-পশ্চিমী দিওয়ান"—প্রতিটি গ্রন্থে তাঁর ব্যক্তিত্বের নব-নব দিক উদ্ভাসিত হয়েছে সহস্রদলের উন্মোচনের মতো। তাঁর সাহিত্যিক মহত্ত্বের নিদর্শন যেমন নিত্যনূতন রূপায়ণে, শতমুখী ব্যক্তিত্বের প্রমাণও তেমনি জীবনবোধের এক পরাদর্শ থেকে অন্য পরাদর্শের সন্ধানে; সে-সন্ধান প্রজ্ঞার প্রশান্তি, কর্ম ও চিন্তার সংতুলন অর্জন না-করা পর্যন্ত নিরস্ত হয় নি। এই নিরন্তর অন্বেষণই তাঁর বিভিন্ন ও বিচিত্র সাধনাপদ্ধতির ঐক্যসূত্র। দ্বিতীয় ঐক্যসূত্রের ভরসায় পৃথক গ্রন্থে পৃথক অংশে রূপক-দ্যোতনার সঙ্কীর্ণ খোঁজা বৃথা।

"ভের্থেরের দুঃখ" সমসাময়িক ইওরোপীয় জীবনে যে-উদ্দীপনা জাগিয়েছিল তা অসামান্য, এই গ্রন্থের অনুকারী রচনার সংখ্যাও দুর্নির্ণেয়। সন্দেহ নেই, এ-গ্রন্থের প্রধান উপকরণ কবির আপন যৌবনকাহিনী, বিশেষত শার্লট বাফ্-এর (গ্রন্থোক্ত লট্) সঙ্গে তাঁর নিষ্ফল প্রণয়াখ্যান। তবু, সমালোচনার জৈবনিক পদ্ধতিতে এমন অসৎপ্রত্যয়ও সম্ভব হয়েছে যে গ্যেটে মূলত স্টুর্ম উণ্ড্ দ্যাঙ্গ, ব্যভিচারিক্ষুব্ধ স্বভাববাদের পরিপোষক, এমনকি তাঁর উদ্দেশ্যই ছিল আত্মকথার ছলে যুগব্যাধির প্রতিচিত্রণ। ভের্থেরের ব্যাধি যুগব্যাধি নিশ্চয়ই, আঠারোশতকী সায়াহ্নের আর্দ্র ভাবালুতার চরম সাহিত্যিক ব্যঞ্জনা অংশত কবির নিজেরও ব্যাধি—কেননা একথা স্মর্তব্য যে লাইপৎসিগ্-প্রত্যাগত তরুণ গ্যেটের স্বাস্থ্য ফিরে পেতে দীর্ঘকাল লেগেছিল। কিন্তু এই পীড়িত বিক্ষুব্ধ সংরাগেরই আদর্শায়িত চিত্র তিনি এঁকেছিলেন, এমন ধারণার সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। বরং এই ধারণার বিরুদ্ধে একেরমানকে তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, "I had lived, loved, and suffered much—that was it... Obstructed fortune, restrained activity, unfulfilled wishes are the calamities not of any particular

time but of every individual man, and it would be bad indeed if everybody had not, once in his life, known a time when Werther seemed as if it had been written for him alone." ব্যর্থকাম হের্থেরের দুঃখ যৌবনের ধর্মানুযায়ী, এই দুঃখের চিত্রণে অবশ্যই সঠিক ব্যঞ্জনা আছে, কিন্তু আদর্শায়ন নেই। হের্থেরের উচ্ছ্বাসে তরুণ গ্যেটের দুঃখের অভিক্ষেপ পাওয়া যায়, কিন্তু এ-দুঃখ নিষ্ফল, এতে আছে কেবল আত্মসংহারের পথনির্দেশ, দুঃখজয়ী সে-আনন্দের সন্ধান নেই, যাতে সংগ্রামক্ষুব্ধ ব্যক্তিত্ব প্রশান্তিধন্য হয়। "হের্থেরের দুঃখ" তরুণ গ্যেটের আপন চিত্তশুদ্ধিরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বেনেদেত্তো ক্রোচের এ-উক্তি নিভুল মনে হয় যে এই চিত্তশুদ্ধি কবির ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে সত্য, উপরন্তু এক আর্টিস্টিক কাথার্সিস্, শিল্পশুদ্ধি, যা বিশুদ্ধ এবং মহৎ শিল্পশক্তির বলেই সম্ভব হয়েছে। নিজের জীবনে গ্যেটে আর কখনোই হের্থেরিয়ানায় মজেন নি, এমনকি তাঁকে অনুকরণ করে যে বহু যুবক যুবতী তাঁর মানসপুত্রের আত্মকরুণা আত্মসাৎ করার শোকাবহ চেষ্টায় রত হয়েছিল। নিজে তিনি বহুদূর এগিয়েছিলেন একাভিমুখী ভাববিলাসের পথ ছেড়ে বহুপ্রয়াসী কর্মের স্থিরপ্রশান্ত পথে; সে-তরুণ শিল্পের উপকরণ ছিল অষ্টাদশশতকী জর্মন সাম্রাজ্যের কেবল ভাবসুত, তার রসঘন বিষয় মিললো কঠিনতর, সূক্ষ্মতর অনুভূতিতে, প্রজ্ঞায়। অতএব, সদ্বিবেকী সমালোচনার জ্ঞানে "হের্থেরের দুঃখ" গ্রন্থে ব্যাধির চেয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধার মহত্তর ঘটনা, এবং গ্যেটের শিল্পজীবনের প্রথম অভিব্যঞ্জক অধ্যায়। তিনি যে একেরমানকে বলেছিলেন,"I call the classic healthy, the romantic sickly."—সে-কথা রোমান্টিক-ক্লাসিক সমস্যার নিরসন না করুক, কবির নিজের শিল্প-বিবর্তনের মূল ধারার নির্দেশ দেয়। প্রবীণ বয়সে "পূর্ব - পশ্চিমী দিওয়ান"-এ গ্যেটে লিখেছিলেন :

একদা তুমি যৌবনদর্পী সহচরের সঙ্গে উদ্দাম লীলা করেছিলে, যেন তোমাকে আসুরিক প্রমত্ততায় পেয়েছিল, তারপরে ধীরে, বৎসরের পর বৎসর প্রজ্ঞা ও দেবদুর্লভ প্রশান্তির নিকট থেকে নিকটতর হয়েছ।

আর এই সঙ্গে প্রত্যেক যুগস্রষ্টা মহৎ শিল্পীর মতো গ্যেটে শিল্পের নূতন ভাষা ও রূপ রচনা করলেন। জর্মন ইতিহাসে গ্যেটে তৃতীয় মহৎ ভাষাস্রষ্টা। দ্বাদশ শতকে বর্বর টিউটনিক ভাষাকে কাব্যরূপ দিয়েছিলেন

ওয়ন্টার ফন্ ডের ফোগেলভাইড ; ষোড়শ শতকে জর্মন ভাষায় নূতন প্রাণ সঞ্চার করলেন মার্টিন লুথার, আর গোটে প্রথমজীবনে সেই-সে নিজীব ব্যবহারজীর্ণ ভাষায় লাইপ্‌ৎসিগে রচিত নিজ তরুণ কাব্য ছিঁড়ে ফেলে নূতনের পরে নূতন রচনায়, কাব্যে, গদ্যে, নাটকে, লিরিকে, উপন্যাসে ক্রমশক্তিশালী ভাষার শিল্পরূপের পুনরুজ্জীবন করলেন, তাতে প্রমাণ হল শিল্পীহিসেবে দুই পূর্বসূরীর তুলনায় তিনি কত মহত্তর। আধুনিক জর্মন ভাষা তাঁরই সাধনায় জন্মালো।

৩

আত্মচেতনার দ্বিতীয় অভিব্যঞ্জনা ফাউস্টের প্রথম পর্ব। ইতিমধ্যে গোটের জীবনজ্ঞান অনেকদূর এগিয়েছে। বিদ্যার্থী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ফাউস্ট অনেকাংশে গোটের পরিবর্তিত সংস্করণ, কেননা উভয়েই অতৃপ্ত, অস্থির, সুদূরের সন্ধানে বেপথুমান। পক্ষান্তরে, গ্রেটের চরিত্র একেবারে, কিন্তু ফাউস্টের যথেষ্ট নয়। অন্তর্দ্বন্দ্বের বিক্ষোভে সে ক্রমশ পরিপুষ্ট হয়েছে, ফাউস্টের তৃপ্তিহীন জ্ঞানপিপাসার বর্ণনায় গোটে নিজেকে ইওরোপীয় রেনেসাঁসের উত্তরসাধক প্রমাণ করেছেন। এ-জ্ঞানপিপাসার সঙ্গে তুলনীয় জর্দানো ব্রুনোর বুদ্ধিপ্রবল জ্ঞানান্বেষণ, বেকনের উক্তি "সমগ্র জ্ঞানের রাজ্যে আমার অধিকার", ডান্-এর অপার জ্ঞানতৃষ্ণা। ফাউস্ট জ্ঞানান্বেষী, কিন্তু অতিপ্রাকৃতে তার আস্থা নেই। ঐতিহ্যগত ধর্মবিশ্বাস তার মনীষা অতৃপ্ত, যুক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োগে অতিপ্রাকৃতের কুহেলিচ্ছেদন তার সাধ্য। অতএব ফাউস্ট সংশয়প্রবণ, সে-সংশয় যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম স্তর মাত্র। এ-পর্যন্ত ফাউস্ট রেনেসাঁসের সন্তান, আঠারোশতকী যুক্তিবাদের প্রতিনিধি। ওয়াগনারকে যে বারবার নিরূপণ করা হয়েছে তা সংস্কারবিরোধী এই যুক্তিবাদেরই অহমিকায়। কিন্তু ফাউস্টের অন্বেষণ শুধু যুক্তিবাদেও সন্তুষ্ট নয়। নীরস যুক্তিবাদ কি অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের মতোই ভিত্তিহীন সংস্কার নয়, একক মনীষা কি পরম সত্যের সন্ধান দিতে পারে? জন স্টুয়ার্ট মিল যেমন সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন যে সর্বোচ্চ সত্যলাভ হয় "রীজন্" বা যুক্তির পথায় নয়, স্বভাবের পথে, যে-স্বভাবের বলে শেলি এবং ওয়ার্ডসোয়ার্থ মানুষের ও প্রকৃতির যথার্থ মূল্যায়নে সক্ষম হয়েছিলেন, গোটে তেমনি বুঝেছিলেন যে অনুপূরক শক্তির

অভাবে যুক্তিবাদ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। যুক্তির অনুপূরক হিসেবে শ্রদ্ধাকে মানতে হবে কিনা, না কি যুক্তি এবং শ্রদ্ধা উভয়েই স্বতন্ত্রভাবে সত্যের অধিকারী, এই তত্ত্ব নিয়ে বহু বিচিত্র তর্ক প্লটাইনাসের কাল থেকে অদ্যাবধি চ'লে এসেছে, কিন্তু এ-সব প্রশ্ন, সংস্কৃতির ইতিহাস থেকে বলা যায়, বিশেষভাবেই আধুনিক যুগের। ফাউস্টে এই প্রশ্নই পরিব্যাপ্ত ব'লে ফাউস্ট আধুনিক মানবাত্মার অখণ্ড প্রতীক। হের্ডেরের মূল কথা যেমন হার্ড ব্রতভা নয়, আঠারোশতকী শিল্পীভূত যুক্তিবাদের প্রত্যাখ্যান, তেমনি সেই প্রত্যাখ্যানই ফাউস্টে পুনরায় প্রতিফলিত। একদিকে অতিপ্রাকৃতে পূর্ণ প্রত্যয়, অন্যদিকে নিত্যসংশয়ী নিষ্ফল যুক্তিবাদ, এ-দুয়ের দ্বন্দ্ব ছাড়িয়ে ফাউস্টের অন্তর্বিরোধ উচ্চতর স্তরে চ'লে যায়, বিশ্বাস সেখানে বিজ্ঞানের বিরোধী। ফাউস্টের অন্তর্দ্বন্দ্বের অন্য এক দিকও আছে। এই কাব্য-নাট্যে সংশয়ের মুখপাত্র প্রধানত মেফিস্টফিলিস, এবং যদিও ফাউস্ট মেফিস্টফিলিসের অনুগামী, তবু দু জনের মধ্যে মৌল 'সু' 'কু'র সম্বন্ধই বর্তমান। গোটের কল্পরাজ্যে 'সু'র প্রাধান্য 'কু'কে নির্বাসিত করেনি, আর রুসোর শিষ্য তিনি যেমন ভোলেননি (রুসো-পন্থা ছাড়িয়ে যতই এগিয়ে থাকুন না কেন) তেমনি নিজের গভীরতম সত্তায় জেনেছিলেন যে প্রকৃতিতে, বহিঃপ্রকৃতিতে যতটা মানুষের অন্তর-প্রকৃতিতেও ততই, কামের প্রভাব প্রবল, দুর্জেয়, দুর্বার সর্বনাশা কাম। যৌবনকালের জনৈক বন্ধুর কাছে প্রবীণ বয়সে একবার তিনি লিখেছিলেন: **"All your ideals shall not keep me from being true and good and bad, like Nature."** সদসতের মর্মান্তিক বিরোধ গোটের সাহিত্যে বহুস্থলে বর্তমান, বিশেষত ফাউস্টের বিখ্যাত স্বগতোক্তিতে এবং ফাউস্ট-মেফিস্ট-ফিলিসের কথোপকথনে। গোটে মন্দকে স্বীকার করেছিলেন ব'লেই তাঁর জীবনদর্শন গ্রহণযোগ্য, এবং লাইবনিৎস্ প্রচলিত অদূরদর্শী আশাবাদের তুলনায় বহুগুণে মহত্তর।

সম্পূর্ণ ফাউস্টরচনার ভাবনা অর্ধশতাব্দী ধ'রে গোটের নিত্যসঙ্গী ছিল। প্রথম পর্ব আরম্ভ করেন হের্ডেরের যুগে, আর মৃত্যুর অল্প পূর্বে তাঁর শেষ গ্রন্থ, ফাউস্টের দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত হল। দুই পর্বে ব্যবধান প্রচুর, প্রথম পর্বেও পরবর্তী সংস্করণে অনেক সংশোধন আছে। এই মহাকাব্যের ইতিহাস অনুসরণ করলে কবির অন্তর্জীবনের ক্রমবিকাশ অনেকাংশে বোঝা

যায়, কিন্তু এই অনুধাবন আপাতত আমাদের লক্ষ্য নয়। এখানে আমাদের এটুকু মতর্ক্য যে হয় গোটে এই কাব্যে যে-রূপক আরোপ করেছিলেন এবং সমালোচকের অনুরূপ সন্ধানের সমর্থন করেছিলেন, সে-রূপকের অস্তিত্ব, অন্তত সক্রিয়তা, প্রথমে ছিল না। বৃদ্ধ বয়সেও একেরমানের সঙ্গে কথোপকথনে রূপকসন্ধানের অসারতাই একবার স্বীকার করেছিলেন

> জর্মনরা অদ্ভুত জাতি। তাদের চিন্তা এবং ধারণার গভীরতার দরুণ—যে-চিন্তা এবং ধারণা তারা সর্বত্র খোঁজে এবং সর্বত্রই আরোপ করতে চায়—তারা জীবনকে অনাবশ্যক পরিমাণে ভারগ্রস্ত ক'রে তোলে। আমি বলি, শুধু এটুকু সাহস রাখো যাতে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারো। নিজেকে উচ্ছল, উদ্দীপ্ত, আনন্দিত হবার সুযোগ দাও, এমনকি কোনো মহতের জন্য শিক্ষিত, অনুপ্রাণিত হবারও সুযোগ দাও, কিন্তু বিমূর্ত কোনো ধারণা না-পেলেই সমস্ত ব্যর্থ মনে কোরো না।

লোকে জিজ্ঞাসা করে ফাউস্ট-এ আমি কোন ধারণাকে মূর্ত করেছি। যেন আমি নিজেই সে-কথা জানি বা জানাতে পারি। যদি বলি "স্বর্গ থেকে পৃথিবীর মধ্য দিয়ে নরক পর্যন্ত" তাহ'লে কিছুটা বলা হয়, কিন্তু এ-ও একটা ধারণা নয়, কাব্য-ঘটনার গতিনির্দেশ মাত্র। যদি বলি শয়তান বাজিতে হারলো, আর মানুষ কঠিন ভ্রমের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম ক'রে অপেক্ষাকৃত সৎ-এর দিকে এগোচ্ছে—তাহ'লে এ-ধারণা কার্যকরী এবং অনেকের মতে প্রাঞ্জল হতে পারে, কিন্তু একেও সমগ্র কাব্যের মূল ধারণা অথবা প্রত্যেক স্বতন্ত্র দৃশ্যের ধারণা বলা যায় না। কী চমৎকারই না হত, যদি আমি ফাউস্টে যে-ঐশ্বর্যবান, বিভিন্ন এবং বিচিত্র জীবনকে উদ্ঘাটিত করেছি তা একটিমাত্র ব্যাপ্ত ধারণার সূক্ষ্ম সূত্রে গাঁথতে পারতাম।

> সংক্ষেপে বলি, বিমূর্তকে মূর্তি দেবার কাজ তো কবির নয়। আমি করি, আমার মূলধন অনুভূতি, ইন্দ্রিয়জাত, প্রাণবন্ত, মনোহর, শতবিচিত্র অনুভূতি—ঠিক যেমনটি কল্পনায় ধরা পড়ে। এর শিল্পসম্মত জীবন্ত রূপসৃষ্টি, যাতে পাঠক বা শ্রোতাও অনুরূপ অনুভূতির অধিকারী হ'তে পারে—এর বেশি কাজ কবিহিসেবে আমার ছিল না।

কবির সাবধানী বাণী সত্ত্বেও যদি কোনো-কোনো সমালোচক রূপকধর্মী অন্তরাখ্যানে নিযুক্ত হয়ে থাকেন তাহলে সে অ-শিল্পসম্মত ভুলের দায়িত্ব অংশত কবিতেও বর্তায়, কেননা দ্বিতীয়পর্ব ফাউস্টের অনেক দৃশ্য এরূপ অন্তরাখ্যানসাপেক্ষ। এই বৃহৎ কাব্যের দুই পৃথক পর্ব একসঙ্গে পড়লে

পাঠকের মনে রূপকসংক্রান্ত প্রশ্ন, দ্বিধা, বিভ্রম জাগা অহেতুক নয়, মলিন জ্যোৎস্নায় ভাস্যমাণ মূর্তির মতো রূপকের আভাসে বারম্বার মন চকল হয়, কিন্তু রূপকবোধ প্রথম পর্বে অনুপস্থিত, সেকথা পূর্বেই বলেছি। দ্বিতীয় পর্বেও কোনো সামগ্রিক সর্বব্যাপী রূপক নেই, আছে স্বতন্ত্র দৃশ্যে, এবং যতটুকু দ্যোতনা আদৌ আছে তা রসগ্রহণ কল্পনার সেই সাহসী ইঙ্গিতমাত্রই যা শেক্সপীয়রের "টেম্পেস্ট"-এ নিবিড়তর আনন্দ দেয়। প্রথম পর্বের শেষে ফাউস্ট মেফিস্টফিলিসের সঙ্গে নরকের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। দ্বিতীয় পর্বের আরম্ভে ফাউস্টকে দেখি নরকদুর্ভোগে ম্রিয়মাণ নয়, পরিশুষ্ক, সবলতর। দুই পর্বেরই মূল কথা এই: অনুভূতিতে প্রত্যয় রাখা চাই। এর বেশি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ দুয়ের মধ্যে নেই। ফাউস্টের দুই পর্ব দুই স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম। একই আখ্যানের আনন্তর্য—তা-ও কালের আনন্তর্য নয়—দুই পর্বের জীর্ণ যোগসূত্র হ'লেও স্রষ্টার মানসের প্রতিনিধন বিভিন্ন। প্রথম ফাউস্টের ইন্দ্রিয়ানুগতা, দুরন্ত গীতপ্রেরণা এবং অদম্য হৃদয়াবেগ দ্বিতীয় পর্বে অনুপস্থিত, আবার দ্বিতীয় পর্বের সুচিন্তিত জীবনদর্শন, জটিল নির্মাণ, অপাতচকল বার্ধক্যের ক্ষমাশীল মৃদু ব্যঙ্গহাসি প্রথম পর্বে মিলবে না। অত্যধিক উৎসাহ অথবা নির্মম প্রচণ্ড বিদ্রূপ—গ্যেটে এখন সমভাবে দুয়েরই অতীত। দ্বিতীয় পর্বের মহিমা তার রূপকে বা দর্শনে নয়, ধারণা এবং অনুভূতির পূর্ণ সমন্বয়ে।

কর্ম ও চিন্তার যে-সংতুলন, বুদ্ধি ও অনুভূতির যে সাযুজ্য, নিজের জীবনে ক্রমবিকশিত যে-প্রজ্ঞা ও প্রশান্তি গ্যেটে তাঁর সাহিত্যে বিস্তার করেছিলেন, তা আয়ত্ত করতে দীর্ঘকাল তাঁর কেটেছিল, অনেক সংশয়, অনেক বিক্ষোভ পার হতে হয়েছিল। তাঁর চিৎশক্তি নিতান্তই একাভিমুখী হ'লে এই প্রশান্তি পেতেন কিনা সন্দেহ। একাভিমুখিতা ছিলো কেবল তাঁর সাহিত্যসাধনায়, কিন্তু এখানেও তিনি সাহিত্যকে চিৎপ্রকর্ষের ঊর্ধ্বে স্থান দেন নি। সাহিত্য তাঁর কাছে পূর্ণ ব্যক্তিস্বরূপের অন্যতম, যদিও তাঁর পক্ষে প্রধান, উপায়। প্রাণশক্তির অসামান্য প্রেরণায় তিনি একাধারে মধ্যযুগীয় অভিপ্রাকৃত সংস্কার, ইতালীয় গ্রীক দর্শন সাহিত্য এবং টিউটনিক পুরাণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। স্পিনোজার দর্শন, রুসোর ভাবানুভূতা, নিউটনের আলোকতত্ত্ব, অ্যানাটমির পরীক্ষাগারিক অনুশীলন, কিছুই তাঁর অনুকম্পার বহির্ভূত ছিলো না। হোমার, শেক্সপীয়র, সমসাময়িক কাব্য,

সর্বত্রই তাঁর অবাধ গতিবিধি, রঙ্গালয়ের পরিচালক হয়েছিলেন, কবি হয়েও রাজ্যশাসনের ভার নিয়েছিলেন ব্রাউনিঙের সোর্ডেলোর মতো। ইওরোপীয় লেখকগণ এই বহুমুখিতার জন্য লেনার্দো দা ভিঞ্চির সঙ্গে গোটের তুলনা ক'রে থাকেন, সে-তুলনা অংশত সার্থক সন্দেহ নেই, কিন্তু সার্থকতর তুলনা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ, কেননা রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবনই শুধু গোটের মতো দীর্ঘ এবং বহুপ্রসারী নয়, উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিত্ব এমন পরোৎকৃষ্ট যে এই ভেবে বিস্ময় লাগে যে ব্যক্তিত্বই মহত্তর, না সাহিত্য। অবশ্য ব্যক্তির চেয়ে কীর্তি বড়ো তাতে সন্দেহ কী, কেননা কীর্তির কারণেই ব্যক্তি শ্রদ্ধেয়। তবু, দুজনেই নিজস্ব সাহিত্যসাধনায় তৃপ্ত না থেকে অপরাপর কর্মে নিযুক্ত হয়েছেন, এমন সব কর্ম, যা হয়তো কারো-কারো মতে শিল্পসৃষ্টির পক্ষে অবান্তর কিংবা কিঞ্চিৎ সহায়ক হলেও পক্ষান্তরে ব্যক্তিত্ববিকাশের প্রতিকূল। হ'তে পারে অবান্তর, হতে পারে প্রতিকূল, কিন্তু এ-অসংগতি শুধু তাঁকেই সাজে যিনি একাধারে মহৎ ব্যক্তি এবং মহৎ শিল্পী। গোটের ওয়াইমার জীবন অবিমিশ্র সুখের ছিল না। কিন্তু সে-জীবনে তিনি মানবাত্মার স্বরূপ, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক, সর্বোপরি, আত্মচেতনার গতি সম্বন্ধে ভূয়োদর্শী হয়েছিলেন। গোটের মতো প্রতিভাবান ব্যক্তি কী ক'রে ওয়াইমারের মতো ক্ষুদ্র রাজ্যের সাবেকি চাল এবং সংকীর্ণ স্বার্থ সহ্য করতে পেরেছিলেন তা কেবল আধুনিক সমালোচকের কাছেই নয়, কবির পিতার কাছেও বিস্ময়কর ছিল। তাছাড়া, যিনি দীর্ঘকাল দেশশাসকের বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন তিনি যে কেন নেপোলিয়নবিরোধী হলেন না, কেন যে জর্মন-ফরাসী বিরোধের পরিবেশে বিদেশীকে ঘৃণা করলেন না, বরং তাঁর weltliteratur, বিশ্বসাহিত্যের দরবারে ফরাসী ও জর্মন লেখককে সমান স্থান দিলেন, তাতেও কারো-কারো অবাক লেগেছে। গ্যেটে ছিলেন ইওরোপীয় ইতিহাসের যুগান্তকারী ঘটনাবলীর সমসাময়িক, অথচ সে-সব ঘটনা যে তাঁর সাহিত্যে প্রত্যক্ষ প্রতিবিম্বন পেল না, এর কারণ তাঁর সমাজচেতনার অভাব কিনা, এ-প্রশ্ন অতীতে বহুবার উঠেছে, এবং আজকের দিনের সাংবাদিক সাহিত্যকামী, রাজনীতির অত্যন্তরাগী সমালোচকও সে-প্রশ্নই তুলছেন। গ্যেটে কখনোই মেঘলোকবাসী ছিলেন না, না জীবনে, না সাহিত্যে। তাঁর প্রাণশক্তি শতদিকে বিচ্ছুরিত ছিলো, তিনি যে সমসাময়িক ঘটনাবলীতে নিঃস্পৃহ ছিলেন তা সম্ভব নয়,

সত্যও নয়। তাঁর কাব্যে প্রত্যক্ষ রাজনীতির পরিহার সুচিন্তিত তত্ত্বপ্রসূত। বর্তমানকালের উত্তেজিত রাজনীতির তর্কধূমল আসরে এ বিষয়ে গ্যেটের ধারণা আমাদের জানবার প্রয়োজন আছে। মৃত্যুর অনতিপূর্বে একেরমানের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি এর বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন :

> যে-কবি রাজনৈতিক কর্মে নিযুক্ত হবেন তাঁকে বিশেষ-কোনো দলভুক্ত হতে হবে, এবং দলভুক্ত হ'লেই কবিহিসেবে তাঁর মৃত্যু হ'লো, বিচ্ছেদ ঘটল তাঁর মুক্ত অন্তরাত্মার সঙ্গে, অপক্ষপাতী দৃষ্টির সঙ্গে। গোঁড়ামির, অন্ধ হিংসার টুপিতে তিনি কান অবধি ঢাকা পড়লেন।
>
> কবি সেখানে মানুষ, নাগরিক, সেখানে স্বদেশপ্রেমিক হ'তে পারেন, কিন্তু যেখানেই কোনো শুভ, মহৎ, সুন্দর, সেখানেই তাঁর কবিত্বের, কবিতার স্বদেশ, তা কোনো বিশেষ দেশে বা প্রদেশে আবদ্ধ নয়।
>
> তাছাড়া স্বদেশপ্রেম বলতে কী বুঝব ? দেশের কাজ কোনটা ? যদি কবি সমগ্র জীবন ক্ষয় ক'রে থাকেন অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে, সংকীর্ণ দৃষ্টি দূর করার চেষ্টায়, আলোকের বিকীরণে, রুচির পরিশোধনে, চিন্তার উন্নয়নে, তাহ'লে তার বেশি তিনি আর কী করতে পারতেন ? স্বদেশের মঙ্গলের জন্য বেশি আর কী করতে পারতেন ?
>
> কবির উপরে এসব অকৃতজ্ঞ এবং অন্যায় দাবী করা ঠিক যেন সেনাপতিকে এ-কথা বলা যে তিনি রাজনৈতিক অভিনয়ে যোগ দিয়ে এবং নিজের প্রকৃত কর্তব্যে অবহেলা করে স্বদেশপ্রেমের প্রমাণ দেবেন।
>
> আমি পাপকে যত ঘৃণা করি, সমস্ত অনিপুণ কর্মকেও তেমনি ঘৃণা করি। সবচেয়ে ঘৃণা করি রাজনৈতিক কর্মে অনৈপুণ্য, কেননা তাতে শতলক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
>
> তুমি জানো, মোটের উপর, আমার সম্বন্ধে কী লেখা হচ্ছে তা নিয়ে আমি ভাবিত নই। তবু কখনো কোনো কথা আমার কানে আসে, আর আমার জীবনব্যাপী পরিশ্রম সত্ত্বেও আমি জানি, যে কারো-কারো কাছে আমার সমস্ত কর্মই নিরর্থক, যেহেতু আমি রাজনৈতিক দলে ভিড়তে ঘৃণা বোধ করেছি।...
>
> মনে রেখো, রাজনৈতিক কবিকে গ্রাস করবে। রাজ্যশাসকদের অন্যতম হওয়া, হাটের ঠেলাঠেলি, উত্তেজনার মধ্যে জীবন কাটানো কবির প্রকৃতিবিরোধী। তাঁর গান থেমে যাবে—তার চেয়ে দুঃখের আর কী আছে জানি না। স্বোয়ারিয়াতে অনেক লোক আছে যারা সুশিক্ষিত, সৎ, কৃতী, এবং সুবক্তা, যারা রাজ্যশাসক হতে পারে, কিন্তু সেখানে উইলাণ্ডের মতো কবি আছেন মাত্রই একজন।

বিকাল সন্ধ্যা রাত

লোকনাথ ভট্টাচার্য

জানি না এ কোন ভাষা সুরবালিকার,
আকাশ কি মদালস রঙের জোয়ারে—
'আরো ধীরে দোল খাই' হয়তো অশথ-সাধ,
পড়ন্ত সোনায় তার নয়নাভিরাম ?

আলোকপিপাসু এক আঁধারের শিশু
আমি চেয়ে চেয়ে ভাবি তোমারি সে নাম ?

ক্রমে আরো অন্ধকার স্নেহাবগুণ্ঠনে ;
না না, সে তো স্নেহ নয়, স্নেহ কী জানি না—
তবু বেশ ভালো লাগে, হয়তো ভালোই লাগে ;
কখন মন্দিরে ওঠে শাঁখ।

একবুক অন্ধকার কতদিনকার
হঠাৎ চমকে চাই এই কি তোমার
এই কি তোমার ডাক ?

ধীরে নামে রাত, ধীরে নামে সুর—
রাত নয়, নীরবের নিবিড় রাগিণী;
কেন খুঁজি, সব মিছে, সত্য সুচতুর
লুকোনো সরযূতীর হেমন্তসন্ধ্যায়—

স্মিতাধরা তারা তাই জ্বলন্ত অঙ্গার,
আমারে মানায় না যা তার শেষ হোক।

রাত

লোকনাথ ভট্টাচার্য

কত রাত বিহঙ্গের ? কত রাত পথিকের ?
সূর্যাস্তের সে-বীণায় সেধে-নেওয়া মূলতান
সহমৃতা রঙিন মেঘের।

আকাশে তো তারা নেই, চোখেও পাহারা নেই—
অসহায় তোলে হাত :
জীবনে জোগাবো গান হে প্রাণ কৃপাণ,
সুর দাও, রাত !

সাড়া দিয়ে হানে ভয়, এতটা উদার নয়
এই বিভীষিকা—
এ কালো পাষাণ লেলিহান।

চোখে নিয়ে অন্ধকার বুকে জ্বালে শিখা
তবু এক প্রাণ।

প্রস্তুতি

লোকনাথ ভট্টাচার্য

আকাশে আকাশে সাজ, রঙিন প্রস্তুতি
সূর্যাস্তের মেঘ বলে, তোমাকে পাইনি তাই
গায়ে মেখে ধন্য হই অভাবের চেতনার
সেই মহাদ্যুতি।

তোমাকে পাইনি তাই আমি গেয়ে উঠি,
যেখানে অরণ্যপথ, রাত্রি স্নেহকান্তিহীন
মায়ের সতীন ;

দেখি কি দেখি না তারা ঘনপত্রবনে—
ভয় বাজে হৃদয়ের গভীর গুহায়
গম্ভীর কম্পনে।

তোমাকে পাইনি তাই নিবিড় নিশীথে
প্রণয়পয়োধিজলে কার অঙ্গ-সুরভিতে
পদ্ম জাগে চিতে ;

মদালস আঁখি চায়, শূন্য ছায় কাম,
সৃষ্টির আনন্দে ওঠে তরঙ্গ উদ্দাম—
'তোমাকে পাইনি' এই নাম।

ওরাং গান

রাম বসু

বিয়ের গান

শহর শহর যাস
সকল শহর-যাস
রাঁচি শহর যাস নে রে ভাই না।

রাঁচি শহর
ডাইনি শহর
পা তো থামে না
রাঁচি শহর না।।

ধানের পাতা সুন্দর, ধানের পাতা সুন্দর,
খেজুর পাতা আমরে যাবে হঠাৎ কোনদিন
হঠাৎ একদিন
বাজার পথে সোয়ামি নেয় হাত ধরে নেয় টেনে
বাপের বাড়ি লাগলো আগুন ভাইবোনেরা নেই
বাজার পথে সোয়ামি নেয় হাত ধরে নেয় টেনে।

লালু ভাইয়া মাদল কেনে রে
লালু ভাইয়া বৌও কেনে রে
লালু ভাইয়া মাদল ভাঙে রে
লালু ভাইয়া বৌও ছাড়ে রে
যেমন ক'রে মাদল ভাঙে তেমনি ক'রে কপাল ভাঙে রে।

পাড়ায় পাড়ায় যাস
সকল পাড়ায় যাস
মেয়ের পাড়ায় যাস নে রে ভাই না
মেয়ের পাড়ায় যাস যদি তোর পা তো থামে না
মেয়ের পাড়ায় না।

শিলাবৃষ্টি আসছে ঝেঁপে রে
চল না রে সাঁই গাছের নিচে যাই,
তোর ধুতি আর আমার আঁচল একই হল রে
চল না রে সাঁই গাছের নিচে যাই।

রাখিস তো থাকবো
নয়তো সোজা হাঁটবো
ও কী অমন বাঁকা চোখে তাকাস কেন সাঁই।

ফাগুয়ার গান

আগল কেন খোলা রে
আগল কেন খোলা
বাঁধা মুরগি ভাগলো কোথায় রে।
আগল কেন খোলা রে
আগল কেন খোলা
কেমন ক'রে ভাঙলো খোঁপা রে।

ভাইয়া তোর দুয়ার খোলে
মুরগি ভাগে তাই রে
সাঁইয়া তোর আগল খোলে
ভাঙলো খোঁপা তাই রে।

(মূল থেকে অনুবাদ)

খিল

দেবদাস পাঠক

এ তো কেবল পুরোনো সেই সবার জানা কথা
নতুন ঢঙে চতুর নিপুণতায় ফিরে আজ
বৃথাই তুমি সাজালে, তুমি শোনালে ; আমি জানি
কোথায় হার মেনেছে মন, কোথায় ভীরু ব্যথা
বেজেছে ; তুমি জানো না তাই খামকা হয়রানি ।
তোমার জানা ছিল না ডুবুপাহাড় আছে মনে ;
আকাশে নেই মেঘের লেশ তবুও বানচাল
হিসেবি নাও হয়েছে, ভেঙে গিয়েছে ভীরু হাল ।

যেখানে নদী কুটিলগতি, ঘূর্নিঘোলা জল
অন্ধকারে দুকূল ভাঙে ; ব্যথায় টলমল
হৃদয় নিয়ে, ভেঙেছে ঘর, তবুও ফিরে কেউ
আবার ঘর বেঁধেছে—সেই কুটিল নদী তুমি
ছাখোনি ; বুঝি পাওনি সেই মনেরও পরিচয় ।
নিপুণ কোন শিকারী এসে বিছিয়ে দিল জাল,
সে-জালে ধরা দিয়েছ, মেনে নিয়েছ পরাজয় ।

এ কার হার—ব্যথার ভার পাথর হয়ে বুকে
চেপেছে কার ? বাতাস নেই, আকাশে সেই তারা ;
এ কোন মেঘ নামে না জল, ভেজে না মরা ঘাস ;
ডোবে না মন ডোবে না ; শুধু অবাক দিশেহারা
দুচোখে ভয় । দেয়ালে মাথা কুটেও তবু নীল
আকাশ দেখা যাবে না, দেখা যাবে না বারো মাস
কী ক'রে রং জড়িয়ে যায় সূর্য থেকে মেঘে ;
মানলে হার, সে কার ভয়ে দুয়োরে দিলে খিল ।

দাম

পরিতোষ পাঁ

শঙ্খশ্বেত দু-গালে তার জলের বাঁকা রেখা
শুকিয়ে, আহা লুকিয়ে মেয়ে কেঁদেছে সারারাত,
চোখের কোলে কালিমা, শাদা শীতল দুটি একা
করুণ তার আবেশে ভীরু কুয়াশানীল হাত
সহায় খুঁজে পায়নি বুঝি, বুঝিবা ভালোবেসে
হিসেবি কারা খতিয়ে লাভ দেয়নি কোনো দাম,
ক্ষতির খেয়া বেসাতি তার অগাধ এলোকেশে
তাই তো সুখে আহা কী সুখে হৃদয় ছড়ালাম।

মন তুমি মেনে নাও

নারায়ণ রায়

মন, তুমি মেনে নাও এত বেশী চাওয়া
বোকামি ;—তাও কি হয় ? মুঠো ক'রে হাওয়া
কে ধরবে ? সাইপ্রেস-বীথিকার ফ্রেমে
যে-সন্ধ্যা পড়ল ধরা সেও যাবে নেমে
পট শূন্য ক'রে। বাঁধা সুরের বুনোটে
যে-তরঙ্গ সেও মেশে শূন্যে, শুধু লোটে
স্মৃতির মূর্ছনা। মন, তুমি মেনে নাও
তোমার পাওয়ার সীমা। যে-মূল্যই দাও
একান্ত প্রেমেও প্রাণ পড়ে না। বন্ধক,
ফল্গুগেরো খ'সে পড়ে সূর্যের পালক
কৃষ্ণচূড়া ফুল। বিভ্রান্ত বণিক,
এ-বাণিজ্য ছাড়ো, মন, হও দার্শনিক।

ছুটির চিঠি

(একটি বড়ো কবিতার অংশ)

অশোকবিজয় রাহা

১

খাম ছিঁড়তেই চমকে উঠল এ কার চিঠি ?
একেই বলে ভানুমতীর খেল্ !
এই তো ভানুমতীর দেশ
ডলুর টিলা-বাংলো
নিচে টলমল্ করছে স্ফটিক-হ্রদ
ওপারের পটভূমি
ধূম্রনীল বড়াল-পর্বত ।

বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে বিকেল এখন ?
গোলাপি রোদ ঝরে পড়েছে কাচের শার্সিতে,
টবের চারায় উড়ে বেড়াচ্ছে একটি ছোটো বেগুনি রঙের প্রজাপতি ?
আর হঠাৎ আকাশ থেকে এই চিঠি ?
মনের চাবি হারিয়ে গেছে অনেক দিন
হঠাৎ সেদিন কুড়িয়ে পেলাম সকালবেলা,
ডলুর হ্রদে ।

২

লোকটা ফিরে আসবে কে জানতো
কেউ জানতো
সে তাকে ভোলেনি ।

একটু পরেই সন্ধ্যা নামে
তারপর রাত
আকাশে হলুদ রঙের আধখানা চাঁদ
হ্রদের বুকে ঝিলিয়ে পড়ি শাম্পানে ।

শূন্যে হঠাৎ অদৃশ্য পরির গান
আকাশে সেতার বাজে ?
এক ঝাঁক বুনো হাঁসের ডাক
সূক্ষ্ম হ'য়ে মিশে গেলো হাওয়ায় ।
স্থির হ্রদের মুঠোয় স্তব্ধ শাম্পান
আকাশে স্তব্ধ চাঁদ
দূরে হ্রদের বুকে নোঙর-করা বড়াল-পর্বত ।

লোকটা ফিরে এলো ?

কে শুধোয় ? চাঁদ ? হ্রদ ? পাহাড় ?
কেউ না ।

সত্যি ফিরে এলো ?

কে উত্তর দেবে ?
হাজার যুগের চাঁদ ?
হাজার বছরের হ্রদ ?
হাজার বছরের ঘুমন্ত বড়াল-পর্বত ?
কেউ না ।

বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে
সান্ধ্য চায়ের আসর—
আলো পিছলে পড়েছে দেয়ালে, পর্দায়, টেবিলে,
গড়িয়ে পড়েছে কুশানে, কার্পেটে,
চিকচিক করছে চুলে, জামায়, শাড়িতে
ঝিলিক দিচ্ছে চোখের কোণে, চুড়িতে
চামচে বাজে টুংটাং
চমকে ওঠে পেয়ালা ।
ডলুর আকাশে চাঁদ
হ্রদে দুলছে শাম্পান

P15499

ঝড়—সূক্ষ্ম অদৃশ্য ঝড়
চাঁদের আলোর ঝড়।

৩

সকাল!
আশ্চর্য সকাল!

বেগনি নীল পাহাড়
জাফরানি মেঘ
হ্রদের বুকে রঙের হোলি খেলা।

লন্-এ এসে দাঁড়াই

ঘাসের উপর হীরে-পান্নার কুচি ছড়ানো
গোলমোর ডালে তোড়া-তোড়া সোনালি রোদ

পাখির পাখায় রঙের রামধনু?
আরেক আকাশ—আরেক সকাল চমকে ওঠে।

হ্রদের জলে চেয়ে দেখছি একটি পানকৌড়ির ডুব-সাঁতার
ডুবছে—নেই,
আবার ভাসবে?
কখন?
কোথায়?

রাত্রির প্লেন

অমিয় চক্রবর্তী

গর্জনচক্রের পারে তমিস্রের শূন্যতায় ভাসা
বিদ্যুৎবাষ্পাভ কোটি প্রকাণ্ড সঙ্গরবিন্দু নীচে,
যুগান্ত ঢেউয়ে সে ছন্নতরী—
নিঃশ্বসিত মৌনে চলে যায় ॥

পাহাড় দাঁড়ায় পাশে, এক স্তূপ ছায়া,
আপেক্ষিক লগ্নে স্থিরতর,
তারার তিলক কাটা দূরের কপালে—
ছুঁতে চায় এই নৌকা আকাশে উড্ডীন।
দূরে চলি ঘনতর চন্দ্রহীনতায় ॥

নিবিড় কৃষ্ণতা বায়ু, নেই তবু থরথর
ছুঁয়ে আছে গতি ঐ চলন্ত পাশের ;
হঠাৎ কয়লা-খনি আগুনের লাল-ফাটা ফুল
সমস্ত পৃথিবী-রাত্রে ফোটে পিট্‌স্‌বর্গ—
প্রাণ অঙ্গারের মরীচিকা ॥

নীল আলো প্লেনকক্ষে দৃষ্টি মেলে দেখি
রাত্রি গ[redacted]নালার ধারে :
চেতনার অস্পর্শ শরীর
ছায়া ফেলে ওড়ে,
মগ্ন ধরিত্রীর বুকে স্পন্দিত একাকী ॥

নির্বাণযাত্রীর চলা উঠে আসে আরো মেঘে মেঘে ;
শুভ্র ধূ ধূ শূন্য শুধু অবলীন,

সত্তার স্বরূপ বর্ণ নেই ;
পাশে শেষ সংস্কারের মতো
ছবির পত্রিকা বই টুপি সঙ্গে চলে—
চেনার ঘুমের ঘোরে সে কে
বলে চলি, শুধু চলি ॥

স্বীকার

মণীন্দ্র রায়

ভুলে গেছি, এ কি অভিযোগ, প্রিয়তমা ?
তুমি ভাবো—মনে হাজার লোকের ভিড় !
জীবিকার হাওয়া কত ফাঁকি করে জমা,
পাখী ভোলে তবু আপন শাখার নীড় ?

সেখানে তো শুধু প্রয়োজন নয়, ছুটি !
তৃণে তৃণে টানা মমতার বয়নায়
জাগে নীড় ; ফেরে অন্ধ ঝড়ের মুঠি ;
এ-ওর হৃদয়ে মেটে উভয়ের দায় ।
স্মৃতির ক্ষমায় ঢেকে দেয় যতো ত্রুটি ॥

ভুলি নি, ভুলতে পারি না, কী ক'রে ভুলি ?
তুমি ছাড়া আমি অতীতহারানো ধাঁধা ।
জীবনের যদি স্মরণের জট খুলি
তবু তুমি রবে জীবনের ঢেউয়ে বাঁধা ।

পদ্মা আমার ! ব্রহ্মপুত্র আমি
যেদিন তোমাকে টেনেছি এ বুকে, প্রিয়ে,
মিশে গেছি—জানো মেঘনা—কী ক'রে থামি !
অণুপরমাণু মস্থিত স্মরণীয়ে
ছুঁয়ে দোঁহা খুঁজি প্রাণ-সমুদ্রগামী ॥

কবিমশাই..

বুদ্ধদেব বসু

Can the lover share his soul,
Or the mistress show her mind ;
Can the body beauty share,
Or lust satisfaction find ?

WALTER JAMES TURNER

কবিমশাই, অনেক-তো ধান ভানলেন ;
বলুন এবার, বলুন দেখি সত্যি ক'রে,
ব্যাপারটা কী ? আপনি—হ্যাঁ, আপনি নিজে
দেখেছেন তো প্রেমে প'ড়ে ?

ঠিক না ? তা বলুন না সে কেমনতরো ?
সোজা কথায় বুঝিয়ে বলুন ;
লোকেরা যার তাড়ায় ছোটে নানান পাড়ায়
সেইখানে কি প্রেমের আগুন ?

তা—হ'লে তো শরীরটাতেই সব মিটে যায়।
কিন্তু, দেখুন, মনও আছে ;
মুশকিলটা এই যে মনের আরজি যত
পেশ করা চাই ওরই কাছে।

যেমন ধরুন, কাউকে দেখামাত্র যদি
ঠিক চিনলেন মনের মানুষ,

কেমন ক'রে পাবেন তাকে ? কোন ফিকিরে
এক জোড়া মন, দামাল, বেহুঁশ,

মিলতে পারে ? না গো মশাই, কবুল করুন,
ছটফটানি সবই খাঁচায় ;
উড়তে হ'লে একলা যাবেন, মিলতে হ'লে—
মিলতে হ'লে শরীরটা চাই।

কেমন মজা ;—শরীরটাকে নিংড়ে ছিঁড়ে
কিছুতেই কি ইচ্ছে পোরে!
আবার, মনের সঙ্গে মনের মোকাবিলায়
শরীর এসে জখম করে।

ভালোবাসা ? তা দেখুন না ভালো আমরা
কত কিছুই বেসে থাকি,
সোনাপিসি, কানা বেড়াল, টেবিলচেয়ার
ইত্যাদি সব টুকিটাকি

যাদের সঙ্গে স্মৃতি জড়ায়। তেমনি বিয়ে ;
ঘরকন্না, সঙ্গে খাওয়া, করুণ রঙিন
পিছন-ফেলা পথের কথা চোখে-চোখে ;—
যৌবনের আর মেয়াদ ক'-দিন।

শরীর কিংবা স্মৃতি নিয়ে আমরা আছি।
আচ্ছা এখন বলুন দেখি,
এই যত সব খুচরো নিয়ে জীবন কাটে,
তাদের সঙ্গে প্রেমের কী ?

মনে করুন আপনি যখন দেখেছিলেন
একটি মেয়ের হাতের নড়া
ঝলক দিয়েই অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে,
তারই নাম তো প্রেমে পড়া ?

তখন যে-সব পাতাল-ঠেলা উথালপাথাল
দিয়েছিলো পাগল ক'রে,
সে-উৎসাহ, সে-অশান্তি, সেই আনন্দ
বলুন তো তা কোথায় ধরে ?

কাকের রূপে অবাক হ'য়ে তাকান যখন ;
কিংবা, চৌরঙ্গি-মোড়ে
হঠাৎ কেঁপে থমকে দাঁড়ান কোনো কবির
পুরোনো লাইন মনে প'ড়ে,

এ-সংসারে সেই প্রেম কি ধরে কোথাও
আপনাদেরই মনে ছাড়া ?
আর সেখানেও আয়ু তো তার এক-আধ মিনিট :
না, কাটে না কারোই ফাঁড়া ।

তাই তো বলি, এত-যে গীত বাঁধলেন
আপনাদেরই গোপন সে-গান ;
আমরা দেখুন বেঁচে থেকেই সুখে আছি,
আমাদের আর কেন শোনান ।

সমালোচনা

সাতটি তারার তিমির : জীবনানন্দ দাশ। গুপ্ত রহমান এ্যাণ্ড গুপ্ত, আড়াই টাকা।

আমরা, দশ বছর আগে যারা কৈশোরের বিস্ময়ভূমিতে ছিলুম, আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠ শুরু করি প্রধানত 'কবিতা' পত্রিকার মধ্যবর্তিতায়। রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম ক'রে বাংলা কবিতায় নতুন নিষ্কণ দিতে তখন যে-নবযুবারা অগ্রসর হয়েছিলেন, আমাদের কিশোরকল্পনাকে মুগ্ধ করেছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই, কিন্তু অভিভূত করেছিলেন সম্ভবত মাত্র দু-জন : জীবনানন্দ দাশ এবং সমর সেন। শেষোক্তজন আমাদের মনোহরণ করেছিলেন বোধ হয় তাঁর নির্ময়তা দিয়ে : অপর পক্ষে, জীবনানন্দর নিজস্বতা ছিলো এক আদিম অদ্ভুত হার্দ্যতা।

ভুলতে পারবো না 'মৃত্যুর আগে' বা 'বনলতা সেন' প্রথম পড়ার অনুভূতি। ভুলতে পারবো না অশ্বত্থের উপদেশ, কলেজের পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ। আজো হৃদয়ে শিহরণ তোলে ঘাইহরিণীর ডাক, মাঠের কাটল, শিশিরের জল, কার্তিকের চাঁদ, শঙ্খমালা, হিজলবন, মালাবার পাহাড়ের কিনার, বসন্তের রাত্রির আকাশে পাখিদের কথা পরস্পর, ধানসিঁড়ি নদীর পাশে সোনালি-ডানা চিলের উতল-করা কান্না, লাসকাটা ঘরে চিৎ-হয়ে-শুয়ে-থাকা পুরুষের রক্তের ক্রীড়মান বিপন্ন বিস্ময়, সন্ধ্যার নক্ষত্রের কাছে শান্তির রেখানুসন্ধান : জীবনানন্দীয় পৃথিবীর সঙ্কেত অভিজ্ঞান আমাদের শিরায় ইশারায় সঞ্চরমান। অথচ তাঁর কৃতকর্মে ছন্দের কারুকলা নেই, বাণিত প্রকাশের প্রাকরণিক চাতুর্য নেই, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় মৃদুনিস্তেজ শব্দরাজিকে শুধু পরম্পর স্থাপন ক'রে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু মনোনিবেশ ঘটানোমাত্র আপাত-অবহেলায় বিন্যস্ত এই শব্দরাজির অভি-ভাবেই বিস্মিত হ'তে হয়। দেখা যায় ধূসরিমায় ব্যঞ্জনা, সরলতার বিস্তারেই হৃদয়ের অনুলিখন।

সেই-যে জীবনানন্দ তাঁর জাদু দিয়ে আমাদের আচ্ছন্ন করলেন, তার ঘোর কখনোই কাটলো না। জীবনানন্দীয় আবহসত্তাকে আত্মসাৎ করা অসম্ভব, কিন্তু তাঁর ব্যবহৃত প্রতীক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, এমনকি মাঝে-মাঝে বাক্যাংশ পর্যন্ত পরবর্তীদের কাব্যোদ্যমে লক্ষ্যণীয়: একদিক থেকে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের প্রতিষ্ঠাবান পুরুষদের মধ্যে তাঁর এবং সমর সেনের প্রভাবই বোধ হয় ব্যাপ্ততম।

'সাতটি তারার তিমির' জীবনানন্দর সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ। দশ বছর আগেকার প্রগাঢ় বিহ্বল অনুভূতির স্মৃতিচারণে এখনো আমি অস্থির হ'য়ে উঠি, এবং স্বভাবতই তাঁর কবিতা পরিশুদ্ধ মুগ্ধতা নিয়েই পাঠ করা আমার প্রয়াস। সুতরাং তাঁর এই নতুন কাব্যগ্রন্থের চারিত্রলক্ষণাদি সম্বন্ধে যদি নিজের কয়েকটি উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসাকে ব্যক্ত করি, সে-উৎকণ্ঠার সংস্থান আমার আন্তরিকতাতেই।

জীবনানন্দর কাব্য, মনে হচ্ছে, কোনো নবতর আস্থাকে আহ্বানপ্রবৃত্ত। বিগত পাঁচ-ছ' বছর ধ'রে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে তাঁর যে-সব কবিতা প্রকাশিত হ'য়ে আসছে, তাদের অনুধাবনেই অবশ্য ধরা পড়ছিলো যে পায়ের নিচের ঘাস স'রে যাচ্ছে। 'বনলতা সেন' এবং তার পূর্বে ও পরেও কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর কাব্যে পর্যাপ্ত অর্থনির্মলতা ছিলো। সে-প্রসাদ ইদানীং লুপ্যমান: তাঁর কাব্যগঠনে আজকাল প্রায়ই এক বিপজ্জনক দুরূহতা লক্ষ্য করি। 'সাতটি তারার তিমিরে'র অনেক কবিতারই অন্তর্ব্যঞ্জনার সঙ্গে, কিছুটা আত্মকরুণা নিয়েই বলছি, বার-বার নিজেকে সমন্বিত করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পরিশ্রম প্রতিবারই পণ্ডশ্রম। প্রতীকে, শব্দযোজনায়, বাক্যপ্রয়োগে বহুলতই নিজের পুনরুচ্চারণ এখানে তিনি করেছেন, এবং এই পুনরুক্তিতে কোনো অর্থের ব্যাপ্তি নিশ্চয়ই তাঁর অভিপ্রেত, কিন্তু সে-অর্থ, দুঃখের বিষয়, কোনো আপাতদার্শনিক সন্ধ্যাভাষায় অবচ্ছন্ন। ফলত, যা ছিলো তাঁর মোহিনী কুয়াশা, এখানে তা অস্বস্তিকর ধূম্রজালের মতো মনে হয়। পংক্তির অব্যবধান সত্ত্বেও চিন্তা বহুবিচ্ছিন্ন, এমনকি কোথাও-কোথাও বাক্যরচনাও দুর্বল। কী বলতে চাইছেন, চিত্তের কোন বিভঙ্গের প্রতি বর্তমানে তাঁর পক্ষপাত, কোন প্রতীকিতার অনুজ্ঞা এখন তাঁর মান্য, এই সব প্রশ্ন প্রথম আক্রমণে মাথা খুঁড়ে মরে।

কিকিৎ বিশ্লেষণপন্থী হবার চেষ্টা করছি। জীবনানন্দ আদি অনুভূতির কবি, হৃদয়বেদনার ধূসর পদপাতেই তাঁর কাব্যের স্পন্দন। কখনো বিস্মিত শিশুর দৃষ্টি নিয়ে, কখনো ক্লান্ত পথিকের নিঃসঙ্গতা নিয়ে তিনি জীবনকে দেখে এসেছেন, দেখেছেন প্রকৃতি, পৃথিবী, জীবজগত, মানবজীবন। তাঁর ভাষণে ছিলো এক নিষ্পাপ স্পষ্টতা, এক সহজ নির্ভঙ্গিমা, এবং এই শেষোক্ত গুণ তাঁর কাব্যের প্রভাবক্রিয়ার মৌল হেতু। কিন্তু 'সাতটি তারার তিমিরে' বিশুদ্ধ হৃদয়োচ্চারণ স্বল্পপ্রায়। পক্ষান্তরে, জীবনানন্দ মননমুখাপেক্ষী হয়েছেন, কোনো আত্মদর্শনের জটিলতায় জড়িয়েছেন। এই দর্শনাশ্রয়ের ফলেই, মনে হয়, তাঁর ভাষণে বক্রতা এবং সেই সঙ্গে প্রসাদের অভাব এসেছে। আবেগের সঙ্গে মননের প্রকৃত সমন্বয় ঘটাতে পারলে কথাই ছিলো না, কিন্তু স্পষ্টতই সে-সঙ্গমকাহিনী এখানে শোকান্তিকা। অনেক ক্ষেত্রেই এই গ্রন্থের কবিতা রূপ নিয়েছে নিছক দার্শনিকতায়, এবং সে-দর্শনও অবোধ্য। বুদ্ধদেব বসুর মতে জীবনানন্দর আত্মস্খলনের কারণ তাঁর সাম্প্রতিক তাৎকালিকপ্রবণতা। আমার তো মনে হয় এই প্রাসঙ্গিক উপাখ্যান প্রধান তথ্যের মধ্যেই নিহিত : মননমুখিতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত তাঁর আত্মতনিক অতিচেতনা।

কিন্তু সৌভাগ্যত, 'সাতটি তারার তিমিরে' স্মরণীয় কবিতার সংখ্যাও তুচ্ছ নয়। প্রাক্-পরিবর্তন পর্যায়ের যে-ক'টি কবিতা গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত, তার অধিকাংশই উৎকৃষ্ট। বিশেষ ক'রে প্রথম কবিতা 'আকাশলীনা' একটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছগীতল জীবনানন্দীয় মূর্ছনা।

সুরঞ্জনা, অইখানে যেও নাকো তুমি,
ব'লো নাকো কথা অই যুবকের সাথে ;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা :
নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাতে ;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে ;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার ;
দূর থেকে দূরে— আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেওনাকো আর।...

জীবনানন্দর উপমাপ্রয়োগ প্রথম থেকেই বিস্ময়কর সে-প্রতিভা এখানেও

কোথাও-কোথাও চমক দিচ্ছে। তাছাড়া, অপার্থিব আবহস্বজনে তাঁর যে-নৈপুণ্য সর্বদিদিত, তার আভাসও অনুপস্থিত নয়। উদাহরণত উপমা ও প্রকল্পনার সহবাসে একটি সামান্য অনুভূতির যে-নিগূঢ় ভাস্কর্য নিচের পংক্তি ক'টিতে সংসাধিত, তা সম্ভবত অসামান্য :

যেই সব শেয়ালেরা জন্ম জন্ম শিকারের তরে
দিনের নিষ্ক্রিত আলো নিভে গেলে পাহাড়ের বনের ভিতরে
নীরবে প্রবেশ করে,—বার হয়,—চেয়ে দেখে বরফের রাশি
জ্যোৎস্নায় প'ড়ে আছে ;—উঠিতে পারিত যদি সহসা প্রকাশি
সেই সব হৃদ্‌যন্ত্র মানবের মত আত্মায় :
তাহলে তাদের মনে যেই এক বিদীর্ণ বিস্ময়
জন্ম নিত :—সহসা তোমাকে দেখে জীবনের পারে
আমারও নিরভিসন্ধি কেঁপে ওঠে স্নায়ুর আঁধারে।

('যেই সব শেয়ালেরা')

'রিস্টওয়াচ' একটি ক্ষুদ্র চিন্তাসূত্রের চরম পর্যায়ের অভিব্যক্তি, মধ্যরাত্রে অন্ধকার মশারির পাশে ধক্-ধ'রে-যাওয়া ঘড়ির মতোই এর উচ্চারণ! 'সমারূঢ়'তে সমালোচকের চরিত্রণ স্মরণীয়, এবং সম্ভবত জীবনানন্দর এই একটিমাত্র কবিতাই বিদ্রূপাত্মক :

বরং নিজেই তুমি লেখ নাকি' একটি কবিতা
বলিলাম ম্লান হেসে ;—ছায়াপিণ্ড দিল না উত্তর ;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়,—সে যে আরূঢ় ভণিতা :
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কাশি আর কলমের পর
ব'সে আছে সিংহাসনে,—কবি নয়—অজর, অক্ষর
অধ্যাপক ;—দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি ;...

প্রথাগত পার্থিব উপাদানের সঙ্গে কিছু লঘুতা এবং কিছু রূপকথার অভিনব মিশ্রণ ঘটেছে 'রাত্রি' এবং 'লঘু মুহূর্ত' কবিতা দুটিতে। 'ভিখিরীকে একটি পয়সা দিতে তাহার ভাতৃবৌ সকলে নারাজ'—'লঘু মুহূর্তে' কয়েক ভিখিরীর এই সাদ্ধ্যপ্রতীতি প্রায় ভূয়োদর্শনের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। 'হাঁস' কবিতার সহজ উন্মেষও উল্লেখ্য।

'ভুল'তে প্রত্যেকটি পংক্তির গঠন এমন সমৃদ্ধ, বাক্যযোজনা এমন

সুন্দর, আবহলোক এরূপ উজ্জ্বল যে প্রেমকে যৌবনের কামাখ্যায় ফেলে রেখে পশ্চিম সমুদ্রতীরে সূর্যের নিকট সোমেন পালিতের স্তব্ধতাভিক্ষার কাহিনী গভীর কাব্যরূপ নিয়েছে। অনুরূপ কবিতা আরো অধিক সংখ্যায় থাকলে হয়তো বক্তব্যের সুদূরতা সম্বন্ধে আমার আক্ষেপকে পুরোপুরিই বিসর্জন দিতে পারতুম ; কিন্তু দুঃখের বিষয় 'উন্মেষ', 'ভাবিত', 'দীপ্তি', 'জনান্তিকে', 'নাবিকী' ইত্যাদির প্রারম্ভসুর যদিও স্পষ্ট, পরিণতির দিকে অগ্রসর হ'তে-হ'তে এরা প্রসাদগুণ এবং ছন্দস্পন্দন যুগপৎ হারিয়ে ফেলেছে।

জীবনানন্দ একমাত্র পয়ারছন্দেই লিখে থাকেন ('মহাপৃথিবী'তে কচিৎ কয়েকটি কবিতায় ভিন্নমাত্রার প্রয়োগ লক্ষ্য করেছি), কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে বেশ কয়েক জায়গায় পয়ারের গঠনে শিথিলতা চোখে পড়লো। বিশেষ ক'রে যুগ্মধ্বনির ব্যবহারে জীবনানন্দ অত্যন্তই স্বেচ্ছাচারী, ফল সর্বত্র ভালো হয় না ; এবং তা ছাড়াও কোনো-কোনো পংক্তিতে রীতিমতোই হোঁচট খেতে হয়।

অনেক ঘুরেছি আমি, তারপর এখানে বাদামী মলয়ালী (পৃঃ ৪)
যে সব যুবারা সিংহীগর্ভে জন্মে পেয়েছিল কৌটিল্যের সংযম
(পৃঃ ১১)
না জেনে কৃষক চোত বোশেখের সন্ধ্যার নিলম্বনে প'ড়ে
(পৃঃ ২৯)
যুগান্তের ইতিহাস, অর্থ দিয়ে কূলহীন সেই মহাসাগরে প্রাণ
(পৃঃ ৩০)
স্বর্গত না হোক,— তবু মানুষের চরিত্র সংহত হয় না কি ?
(পৃঃ ৬৫)
মিশে গেলো পরস্পরের কায়ক্লেশে (পৃঃ ৪০)

আশঙ্কা করি, এর কোনো-কোনোটি নিঃসংশয়েই ছন্দপতন—না কি ছাপার ভুল ?

উপসংহারে এ-কথা না-ব'লে পারছি না যে বইয়ের অপরূপ নামের আক্ষরিক অর্থ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় প্রচ্ছদটি সাতটি সুবৃহৎ নক্ষত্রে খচিত, আর তাদের ঘিরে এক তীক্ষ্ণ নীলিমা বিরাজমান। কিন্তু জীবনানন্দর নীলিমাও তো তত উজ্জ্বল নয়।

অশোক মিত্র

Confucius—The Unwobbling Pivot & The Great Digest, Translated with notes and commentary by Ezra Pound. Published for Kavitabhavan by Orient Longmans Ltd. Rs. 2-8.

এজরা পাউণ্ড নাম করা কবি—খুব বড় কবিও বলা চলে, কারণ তাঁর এবং তাঁর অনুগামী টি. এস. এলিয়টের কবিতা 'বাংলার তরুণ ও অনভিতরুণ কবিদের' অন্তরে যে দোলা দিয়েছে অন্য কোন সমসাময়িক কবির রচনা তা পারে নি। তাঁর কবিতার গুণাবলী নিয়ে ইতিপূর্বে 'কবিতা' পত্রিকায় বিশদ আলোচনা হ'য়ে গিয়েছে। পাউণ্ডের আলোচ্য গ্রন্থ কবিতা নয়—একে ইতিহাস বা রাজনীতি বলা চলে, আমাদের পুরোনো রীতি অনুযায়ী নীতিশাস্ত্র বললেও ভুল হবে না। এ গ্রন্থ প্রাচীন চীনা সাহিত্য হ'তে অনুবাদ। অনুবাদ করতে গিয়ে পাউণ্ডকে ভাষাবিদ হতে হয়েছে। চীনা ভাষায় তাঁর কতটা অধিকার আছে তা আমরা জানি না, কারণ যে গ্রন্থে তিনি অনুবাদ করেছেন ইউরোপীয় ভাষায় তার একাধিক অনুবাদ আছে—১৮৫৩ সালে Callery'র প্রথম ফরাসী অনুবাদ, ১৮৮০ সালে Zottoli'র লাটিন অনুবাদ, ১৮৮৩ সালে Carlo Puini'র ইতালিয়ান অনুবাদ। ১৮৭৮ সালে Couvreur-এর "Les Quatre Livres" নামক যে ফরাসী ও লাতিন অনুবাদ প্রকাশিত হয় তা এখনো প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ১৮৮৩ সালে Sacred Book of the East Series-এ J. Legge, The Li-Ki নামক ইংরাজী অনুবাদ করেন। Couvreur-এর ফরাসী অনুবাদে যে মূল গ্রন্থ অবলম্বন করা হয়েছে, পাউণ্ডও সেই গ্রন্থই ব্যবহার করেছেন। প্রাচীন অনুবাদের সাহায্য হয়তো তিনি নিয়েছেন, কিন্তু তা সংশোধন করবার মত ভাষাজ্ঞান তাঁর আছে। অনুবাদের চাইতে বিষয়বস্তুই এ-ক্ষেত্রে প্রধান—তা পাউণ্ডকে চমক লাগিয়েছে বলেই তিনি তা নিজের ভাষায় রূপান্তরিত করেছেন। সে ভাষা স্বচ্ছ, সুন্দর ও সহজবোধ্য।

কনফ্যুসিয়স ছিলেন অত্যন্ত দূরদর্শী। তিনি বুঝেছিলেন যে শতধা বিভক্ত চীন জাতির দুরবস্থা দূর করবার একমাত্র উপায় তার সমাজ ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের দ্বারা বিশৃঙ্খলা দূর করে সমাজ ও রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল করা। প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে যে সব ভাবধারার খোঁজ পেয়েছিলেন সেগুলিকে তিনি সংগ্রহ

ক'রে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন—তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যে চীন জাতি সেই সব বিধান অনুসারে নিজেদের শিক্ষাদীক্ষা, সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করবে।

প্রত্যেক জাতি তার বিশেষ পরিবেষ্টনীর মধ্যে বহু শতাব্দী ধরে যে সমাজপ্রথা ও শাসনতন্ত্র ধীরে ধীরে গড়ে তোলে তা তার পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। যতদিন সে সব বিধানের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে ততদিন তার সমাজ ও শাসনব্যবস্থায় সমতা রক্ষিত হয়। তা না হ'লেই অন্তর্বিপ্লব দেখা দেয়। সে জাতি যদি শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত স্থান গ্রহণ করে তা হ'লে তার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এমন ভাবধারার প্রতিষ্ঠা হ'তে পারে যা অন্য জাতির পক্ষেও গ্রহণযোগ্য। কনফ্যুসিয়সের সংগৃহীত ও সম্পাদিত সমাজ ও শাসনবিধিগুলি সেই কারণে চীন জাতির সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য—অন্যত্রও সমাদর পাবার যোগ্য। সেইজন্যই এজরা পাউণ্ড কনফ্যুসিয়সের গ্রন্থের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন। এ কথা তিনি তাঁর ভূমিকাতেই স্পষ্ট ক'রে বলেছেন

"শাসনতন্ত্র আর রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা নিয়ে অন্য যে-কোনো দার্শনিকের তুলনায় কনফ্যুসিয়স ভেবেছিলেন অনেক বেশি। ভাবতে হয়েছিলো, মার্কেট ইন্সপেক্টর থেকে প্রাইম মিনিস্টরের পদে উঠেছিলেন তো। অতীতের দু হাজার বছরের লিখিত ইতিহাসের সারাংশ এমন ক'রে লিখেছিলেন যাতে বড়ো-বড়ো সরকারি চাকুরেদের কাজে লাগে। হেরোডোটস্-এর মতো কতগুলি টুকরো গল্পের সংগ্রহ লেখেন নি। আগেকার বড়ো-বড়ো সম্রাটদের শাসনতন্ত্রের মহত্ত্ব কোথায়, তার কনফ্যুসীয় বিশ্লেষণ এতই সারবান যে তাঁর সময়ের পর থেকে চীন দেশের প্রত্যেকটি দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশের সূত্রপাত করেছেন কোনো কনফ্যুসীয় সম্প্রদায়, আর তা গ'ড়েও উঠেছে কনফ্যুসীয় প্রতিমানের ভিত্তিকে। চীন ততদিনই শান্ত ছিলো, যতদিন দেশের কর্তারা কনফ্যুসিয়সে এ-পাতা ক'টি বুঝতেন। এখানে যে-সব মূলনীতি সংজ্ঞিত হ'লো তার অবহেলার সঙ্গে-সঙ্গেই রাজবংশে ভাঙন ধরলো, দেখা দিলো বিশৃঙ্খলা। যে-একমাত্র প্রণালীর সমাজ-সংশ্লেষণী কার্যকারিতা বার-বার প্রমাণিত হয়েছে, তাকে উপেক্ষা করা বিশ্বব্যবস্থার প্রস্তাবকারীদের পক্ষে মারাত্মক।" (অনুবাদ—কবিতা, চৈত্র ১৩৫৫)

পাউণ্ড কনফ্যুসিয়সের দু'খানি গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। প্রথমখানির নামকরণ করেছেন The Unwobbling Pivot ; ফরাসী অনুবাদক এর নাম দিয়েছেন L' Invariable Milieu. Legge নাম দিয়েছেন—The State of Equilibrium and Harmony, কিন্তু তা চীনা নামের সঠিক অনুবাদ নয়, শুধু অর্থজ্ঞাপক। চীনা নাম—চুং ইউং—"ধ্রুব মধ্যম"। এই ধ্রুব মধ্যম হচ্ছে মানুষের অন্তরাত্মা (inborn nature)। সেই অন্তরাত্মাকে উপলব্ধি করা, তার বিধি অনুযায়ী কাজ করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। যিনি তা করতে সক্ষম তাঁকে বলা যায় ঋষি (Sage man)—পাউণ্ডের 'Man of breed' তিনি শোক, তাপ, রাগ, দ্বেষ, আনন্দ ইত্যাদির দ্বারা বিচলিত হন না—কারণ তিনি সেই ধ্রুবমধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত। রাজা হ'তে প্রজা পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষই যদি এই নীতিকে অবলম্বন করে, তাহলেই রাষ্ট্র, সমাজ, গোষ্ঠী সবই সুনিয়ন্ত্রিত হয়। সম্রাট যদি সেই 'অন্তরাত্মা'র সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে রাজ্য পরিচালনা করেন, তাহ'লে দেশে দুঃখ দারিদ্র্য থাকে না, অনাচার ঘটে না, রাষ্ট্রবিপ্লব হয় না—সকলেই সুখ শান্তিতে বাস করে। তিনি যখন সেই নীতি থেকে বিচ্যুত হন তখনই অনাচার আরম্ভ হয়। সমাজপতি, গোষ্ঠীপতি প্রত্যেকের সম্পর্কে ঐ একই নীতি প্রযোজ্য। কনফ্যুসিয়সের Ethics, Metaphysics প্রভৃতি এই কেন্দ্র অবলম্বনে রচিত।

পাউণ্ডের অনূদিত দ্বিতীয় গ্রন্থ হচ্ছে—The Great Digest (ফরাসী অনুবাদ—La Grande Etude)। এই অনুশীলন বা শিক্ষার মূলসূত্র 'Self-discipline', যাকে বলা যায় চিত্তশুদ্ধি। কনফ্যুসিয়স এই 'self-discipline'-এর ব্যাখ্যা করেছেন—acting straight from the heart, rectification of the heart, sincerity ইত্যাদি। চিত্তশুদ্ধির দ্বারাই 'ধ্রুব মধ্যম'কে পাওয়া যায়, সেই কারণেই রাষ্ট্র, সমাজ, গোষ্ঠী প্রভৃতির পরিচালনায় পরিচালকদের মূল শিক্ষাই হচ্ছে চিত্তশুদ্ধি। যিনি তা না পারেন তাঁর চিত্ত উদ্ভ্রান্ত থাকে। তাঁর সমস্ত কাজ হয় ভ্রমাত্মক।

কনফ্যুসিয়সের নীতির সঙ্গে আমাদের নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্রধর্ম প্রভৃতির অনেক মিল দেখা যায়। হয়তো ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের কোন অনুবাদ পেলেও এজন্য পাউণ্ড চমকে যেতেন। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে কনফ্যুসীয় নীতি চীন দেশে কতটা প্রতিপালিত হয়েছে। চীনদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা

করলে দেখা যায় কনফুসিয়স তাঁর জীবদ্দশায় রাজাদের দিয়ে এ সব নীতি অনুযায়ী কাজ করাতে পারেন নি। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে শে-হোয়াং তি সমস্ত চীনদেশকে ঐক্যবদ্ধ করবার পর কনফ্যুসীয় সাহিত্য পুড়িয়ে দেন, কারণ তাকে তিনি শাসনব্যবস্থার পরিপন্থী মনে করতেন। প্রাচীন স্থিতিশীল রাজবংশ দু'টি—হান্ ও থাং বংশ—বহুদিন রাজত্ব করেছিল, কিন্তু তাদের ক্ষমতাও গ'ড়ে উঠেছিল বিরাট সামরিক শক্তিকে কেন্দ্র ক'রে। সুতরাং কনফ্যুসীয় নীতিশাস্ত্র কোনদিনই রাষ্ট্রপরিচালনার ব্যাপারে সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হয় নি। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে তার বহুল প্রয়োগ ছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

বর্তমান চীনের জাতীয় জীবনে কনফ্যুসীয় নীতির স্থান কতটা তা সঠিক বলা যায় না। কনফ্যুসীয়দের নীতি সাম্রাজ্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্রাট হচ্ছেন Son of Heaven ; তিনি ঈশ্বরের আদেশেই রাজ্যশাসন করেন, সেই কারণেই তাঁকে পদে-পদে ঐশ্বরিক অভিপ্রায় বুঝতে হয়—চিত্তশুদ্ধি ও ধ্রুবমধ্যমের সাহায্যেই তা বোঝা সম্ভব। বর্তমান চীন সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করেছে। তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবার কথা ওঠে না। অর্থনৈতিক কারণে প্রাচীন সমাজপ্রথা ধ্বংসের মুখে—কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ব্যাপারে কনফ্যুসীয় নীতিশাস্ত্রের আর কোন স্থান নেই। আছে ব্যক্তিগত জীবনে। ভবিষ্যৎ কালের চীন কি বর্তমান যুগোপযোগী রাষ্ট্রের সঙ্গে তার প্রাচীন নীতির সামঞ্জস্য বিধান করতে পারবে? সে রকম কোনো লক্ষণ এখনো দেখা যায় নি। এজরা পাউণ্ডের আশা দুরাশা ব'লেই মনে হয়।

এজরা পাউণ্ডের অনুবাদ নিয়ে কোনো কোনো স্থানে মতান্তর ঘটতে পারে, কিন্তু পূর্বেই বলেছি যে তাঁর কাছে কনফ্যুসীয় ভাবধারাই প্রধান—তাঁর অনুবাদের ভাষায় সে ভাবধারা ক্ষুণ্ণ হয় নি বলেই মনে হয়।

প্রবোধচন্দ্র বাগচী

হারামণি (লোক-সংগীত সংগ্রহ) **সম্পাদক—মুহম্মদ মনসুর-উদ্দীন :** হাসি প্রকাশালয়, পঁচিশ সুরীটোলা, ঢাকা। ১৸০

বইটি দু-অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এবং মুর্শিদাবাদে প্রচলিত মেয়েলি গানের সংগ্রহ। এই গানগুলির উপলক্ষ্য-যে কোনো-না-কোনো পালাপার্বণ ব্রত উৎসব, এবং তাদের রচনাকালও-যে বিভিন্ন তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় সংগ্রহকারীর টীকাটিপ্পনী না থাকায় এ-সব অনুমান কোনো সমর্থন পায় না, তাছাড়া, কেবলমাত্র নিজের চেষ্টায় আকাঁড়া গ্রাম্যভাষার ঝোপঝাড় অতিক্রম করাও পাঠকের পক্ষে দুরূহ। এরূপ পুস্তকে সম্পাদকীয় কর্ম অপরিহার্য।

উপরোক্ত অভিযোগ অবশ্য তাঁরাই বিশেষভাবে আনবেন, যাঁদের বিবেচনায় মৃৎমলিন লোকসাহিত্য সমাজ-ইতিবৃত্তের অন্যতম উপাদান মাত্র। আর রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' যাঁদের মনে আছে, তাঁরা নিশ্চয়ই এ-সব গানে সেই সহজ কাব্যরস খুঁজবেন, যা কণ্টকিত টীকাটিপ্পনীর অপেক্ষা রাখে না। ব্যক্তিগতভাবে দ্বিতীয় পন্থাই আমার গ্রাহ্য। সম্পাদকীয় ত্রুটি আমি উপেক্ষা করতে পেরেছি; হয়তো অনেকেই পারবেন।

বাংলার প্রান্তিক পল্লীবাসিনীদের জীবন রোমাঞ্চকর নয়। পরিশ্রম আর বিশ্রামের সংকীর্ণ পুনরাবর্তনে গার্হস্থ্য সুখদুঃখের মিহিমোটা সুতোতেই তাদের নিস্তরঙ্গ জীবনের টানাপোড়েন। কিন্তু মুছিত দিঘিতেই তো পদ্মফুল ফোটে, লতাগুল্ম জন্মায়। মানুষের কোমল বৃত্তির প্রকাশ তার আটপৌরে জীবনেই, যেখানে সে পিতা কিংবা মাতা, ভাই কিংবা বোন, স্বামী কিংবা স্ত্রী। আলোচ্য সংকলনের অধিকাংশ গানই ভূমিনির্ভর বাংলার পারিবারিক কথাকাহিনী—অশ্রুস্নিগ্ধ, অনাড়ম্বর :

> সোনার খাঁচায় পালিলাম পায়রা, রূপার খাঁচায় আঁধার রে।
> কার বা লাগ্যা পালিলাম পায়রা, কে বা লইয়া যায়রে।
> উড়িল বৈদেশী পায়রা, চলিল বৈদেশী পায়রা।
> পায়রার মায় তো কান্দন করে খেউরের হাসি লইয়া।
> আগে যদি জানতাম, সোনার কোকিল, পরে লইয়া যাবে।
> কিকিয়া কালাইতাম ঐ না নদীর মাঝারে।

যাবার কালে না গেলা কোকিল মায়েরে বোলাইয়া
যাবার কালে না গেলা কোকিল বাপেরে বোলাইয়া ॥

এ আমাদের চিরপরিচিত বাঙালী মায়ের অশ্রুপাত, অবোধ বালিকা কন্যাকে দূর গ্রামে, অপরিচিত পরিবেশে চিরদিনের মতো নির্বাসন দেবার এই দুঃখ অসংখ্যবার প্রকাশিত হয়েছে আমাদের প্রাণস্পর্শী গ্রাম্য ভাষায়। পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত 'আজ দুর্গার অধিবাস কাল দুর্গার বিয়ে'—যা রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত করেছেন—এর সঙ্গে তুলনীয়।

বলা বাহুল্য, বাপ-মা ভাই-বোনের অন্তরঙ্গ অভ্যস্ত পরিবেশ ত্যাগ ক'রে শ্বশুরবাড়ির নূতন আবহাওয়ার সঙ্গে রাতারাতি ঘনিষ্ঠ হওয়া অপ্রাপ্তবয়স্ক নববধূর পক্ষে সহজ নয়। পদে পদে তার স্বাধীনতা ব্যাহত হয়, উঠতে বসতে পুরোনো গৃহকোণের জন্য মন কাঁদে :

ওগো তোমরা কে যাও রে ভাটী গাং বাইয়া।
আমার ভাইয়েরে সম্বাদ কইও নাইয়র নিত আইয়া।
আমারে দিয়াছে বিয়া তালগাছয়ালা বাড়ী চাইয়া
হে ইয়ারা মারতেরে মারে তালের ডাউগ্যা দিয়া।
তোমরা কে ও যাওরে ভাটী গাং বাইয়া।

বাপ-মায়ের আর দোষ কী। বড়ো-বড়ো তালগাছওলা বাড়ি দেখেই তাঁরা মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ির লোকদের বিত্ত থাকলেও চিত্ত নেই। তবে 'তালের ডাউগ্যা'র ব্যাপারটা হয়তো কাব্যিক অতিরঞ্জন, কেননা, যে-মাঝিকে উদ্দেশ্য ক'রে এই আবেদন, তার উত্তরে আন্তরিক সান্ত্বনা থাকলেও আশু প্রতিকারের চেষ্টা নেই :

এই বছর থাক গো বোন কান্দিয়া কাটিয়া
হোমকের বছর নিতাম আইয়াম হাইট্যা গুণ লইয়া।
হাটিয়া ধানের মুটিয়া চিড়া বিন্নীধানের খৈ
কাডল ভাঙ্গি তালাস করইয়াম ছাকিনা আপা কই।

শুধু তার জন্যই 'হাইট্যা গুণ' আসবে, তাকে উপলক্ষ্য ক'রেই আসবে 'হাটিয়া ধানের মুটিয়া চিড়া' আর 'বিন্নীধানের খৈ'—এই চাটুকারিতায় বালিকাবধূর মন আশ্বস্ত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। কিন্তু অন্য দুটি ছড়ায় অপর দু'জন অভিমানিনীর সাক্ষাৎ পাই, প্রথমটি একেবারে চরমপন্থী

ভাই ছাহেবের দেশের কেহই নাই, শুয়া পক্ষী হইয়া উড়িয়া যাই।
উড়িয়া গিয়া দেখি ভাইয়ের চন্দ্রমুখ।

কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো আর 'শুয়া পক্ষী' হওয়া যায় না, তাই

আন ভাই, আন, কটরা ভরা গরল বিষ
মরিয়া যাই আমি ভাইয়ের গলার জঞ্জাল।

অপরজনের মন মায়ের উপর একেবারে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে :

এত যদি জানতাম, আম্মা, যাও হইবে পর
দুয়ারেতে উঠাইয়া থুইতাম জলটুঙ্গির ঘর।

এ-সব গানেরও পশ্চিমবঙ্গীয়, প্রসিদ্ধতর সংস্করণ অনেকের মনে পড়বে

'এপারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুকটুক করে।
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে॥'
'এ মাসটা থাক্ দিদি, কেঁদে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পালকি সাজিয়ে॥'
'হাড় হোলো ভাজা ভাজা, মাস হোলো দড়ি।
আয়রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি॥'

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে মাতাকন্যার বিচ্ছেদের বা মাতৃস্নেহের উদাহরণই সর্বাধিক উদ্ধৃত, কিন্তু 'হারামণি'তে প্রোষিতভর্তৃকারও সাক্ষাৎ মেলে, 'নিশীথ রাত্রির খামশে' নবযুবতীর কান্নাও শোনা যায়। চৈত্রের 'ভরা রাত্রে কাঁদছে কে, পাড়াপড়শীরা জেগে উঠে প্রশ্ন করে। না, মারাত্মক কিছু না, এ-কান্না বিরহিণীর।

কুলগাছি কুইলাম বছরের শেষ।
কুলগাছের তলায় গো ভ্রমর রোদন করে।
ভ্রমরের রোদনে পাড়াপড়শী জাগে।
যেইগা নারীর নাই গো পুরুষ সেই বা নারী কান্দে।

মাঝে মাঝে এক-একটি সুন্দর ছবি চমকে দেয় :

গাঙের কূলে মোচন ফুলের গাছ, বন্ধু রে,
টলমল বাতাসে ঝিলিমিক।

এবং কখনো রামসীতার বিবাহ উৎসবকে উপলক্ষ্য ক'রে, কখনো বা রাধাকৃষ্ণ ভজনার অছিলায় কখনও বাঙালী বধূর অন্তরঙ্গ ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হতে দেখি। অবনীন্দ্রনাথও মনে করেন যে 'খাঁটি মেয়েলি ব্রত ঠিক কোন দেবতার পুজো নয়। এর মধ্যে ধর্মাচরণ কতক, কতক উৎসব; কতক চিত্রকলা নাট্যকলা গীতকলা ইত্যাদিতে মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি,

কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া।' বাঙালী-যে চিরকাল মানব-সম্বন্ধসূত্রে, অর্থাৎ, মাতারূপে, কন্যারূপে, বন্ধুরূপে, এমন কি পত্নী বা স্বামীরূপে ঈশ্বরকে কামনা করেছে, তার মূলেও অবরুদ্ধ কামের উদ্গতি ? হয়ত।

'হারামণি'র দ্বিতীয় অংশ লালন ফকিরের গান। গানগুলি ভক্তিমূলক হলেও সাহিত্যরসচ্যুত নয়, প্রায়ই রামপ্রসাদের পংক্তি স্মরণ করায়। লালন ফকির কোন শতাব্দীর লোক, কোন জেলাতেই বা তাঁর নিবাস, এ-সব তথ্য জানতে পাঠকের কৌতূহল স্বাভাবিক, কিন্তু সংগ্রহকারী এ-বিষয়ে কিছুই বলেন নি, এবং, আশ্চর্যের বিষয়, দীনেশচন্দ্র সেন বা সুকুমার সেনের গ্রন্থাদিতেও এই ভক্ত কবির কোনো হদিশ মিললো না। তবে রচনাভঙ্গীর দিক থেকে বিচার করলে লালন ফকিরকে উনিশ শতকের শেষ দশকেই স্থাপন করা যায় এবং তিনি-যে সাঁই বা কর্তাভজা ছিলেন আর আউল-বাউল সুফী-দরবেশদের মতোই মুক্ত মনের মানুষ ছিলেন, সে-বিষয়ে প্রায় নিশ্চিত অনুমান সম্ভব হয়।

বাংলাদেশের মৌল অখণ্ডতার লোকসাহিত্য শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। নানা জেলার ভাষায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে একই ছড়া যখন, পড়ি, এবং 'গুণবতী ভাই'কে 'ভাই ছাহেবের চন্দ্রমুখে' রূপান্তরিত দেখি, তখন যে-শুভ্র সত্য অনুভব করি, উন্মত্ত বর্তমান সত্তা কি তাকে লুপ্ত ক'রে দেবে ?

অরুণকুমার সরকার

রাশিয়ার কবিতা, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অভিযান পাবলিশিং হাউস, আড়াই টাকা।

'রাশিয়ার কবিতা'য় কবিতা নেই, রাশিয়াও না। শেষাংশের সোশিওলজিক্যাল আর ইতস্তত ছিটোনো টাপির ট্রইকা তৌবির বাদ দিলে বইটিকে মনে হয় ১৯২০ বা '২৫ সালের কোনো সুখস্মৃতি, তৎকালীন প্রবাসী ইত্যাদির পাদপূরণ-পদ্যের একটি অনুৎকৃষ্ট চয়নিকা বললেও ভুল হয় না। কেননা এতে (কতকাল পরে বলো তো!) 'ফাগুনদিনের সোহাগস্বপন' দেখলাম, 'হৃদয়কাড়া চাহনি'র পরেই 'উচ্ছ্বসিতালা চুম্বন জ্বালাময়' হ'য়ে উঠলো। তার উপর 'হায়' আছে, 'চুমি' আছে (কাছাকাছি 'তুমি' খুঁজুন), 'হিয়া'

আছে, 'প্রিয়া' আছে, হিয়ায়-প্রিয়ার মিল পর্যন্ত আছে, তাও একবার দু-বার তিন বার না, এস্তার। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুকারকদের প্রতি বোধহয় কিঞ্চিৎ অবিচার করা হ'লো, কেননা সে-ইস্কুলের কোনো ছাত্র 'খসখসযম শব্দায়মান সিল্কের সজ্জায়' নায়িকাকে সাজাতে যদি-বা পারতেন, 'সবুজ তৃণদলে' 'হিসহিস ধ্বনি' উৎপন্ন করতে কখনোই পারতেন না।

তুলনা করুন। মরিস বারিং-এর ইংরেজি অনুবাদে পুশকিনের 'The Prophet' কবিতার শেষ ক-লাইন :

And God called unto me and said
"Arise, and let my voice be heard,
Charged with My will go forth and span
The land and sea, and let My word
Lay waste with fire the heart of man."

সৌম্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ

ভগবৎ-বাণী শুনিলাম শূন্য-তলা—
মানুষের গুরু, জাগ্রত হও তুমি,
হের চারিদিক, শোন সব মন দিয়ে,
বেষ্টিত করো তব আত্মার ভূমি
মোর ইচ্ছার মহা-তরঙ্গ নিয়ে।
ধূসর সাগর আর পশু আঁধিয়ার,
পার হয়ে চলো ভয়হীন মনে তুমি,
দগ্ধ হউক প্রাণের অন্ধকার,
আমার বাণীর আগুনের শিখা চুমি'।

কোনটা মূলের অধিক সন্নিকট সে-কথা ওঠে না, অনুবাদের ভাষায় কবিত্ব হওয়াটাই জরুরি। মূলের প্রাণ যদি পাকড়ানো গেলো তাহ'লে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রায় যে-কোনো স্বাধীনতা নিলে দোষ কী। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে বারিং-এর তর্জমা আক্ষরিকতার দিক থেকেও অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য লাগে, তার কারণ আপেক্ষিক পংক্তিসংখ্যা এবং ঘনতা। পাঁচটি নিবিড় পংক্তির বদলে ন-টি শিথিলতরল লাইন লিখেছিলেন পুশকিন? সম্ভব না।

আরো আপশোষ এই যে সৌম্যেন্দ্রনাথ মূল থেকেই অনুবাদ করেছেন ব'লে আমাদের মনে কুহকিনী আশা জেগেছিলো। 'রাশিয়ার কবিতা'য় তিনি

অন্তত 'মূল থেকে অনুবাদ' বিষয়ক কুসংস্কার নির্মূল করলেন। এর প্রয়োজন ছিলো।

অনুবাদকের যে-গুণ না-হ'লেই নয় তা সাহিত্যের বোধ, বুদ্ধি, কান, আর সেই সঙ্গে নিজের ভাষায় ওস্তাদি। তা যদি না থাকে, শুধু মূলের ভাষা জানলে কিছু হবে না। আর তা থাকলে, এবং পরিশ্রমী হ'লে, অনুবাদের অনুবাদেও কাজ চ'লে যায়। রেনেসাঁসের সময় ইওরোপের নানা দেশে অনুবাদের অনুবাদ, এমনকি দু-তিন-হাত ঘোরা অনুবাদেও দেশীয় সাহিত্যের মোড় ফিরেছে।

অবশ্য উভয় গুণ একত্র হ'লেই সবচেয়ে ভালো। সৌম্যেন্দ্রনাথের একটি গুণ আছে, অন্যটির জন্য সচেষ্ট হবার বোধহয় সময় পাননি। অথচ অনুবাদে তাঁর একেবারে যে হাত নেই তা নয়। 'পরিচয়ে'র প্রথম বছরে দান্তে নৎসিওর একটি কবিতার স্মরণীয় অনুবাদ তাঁর বেরিয়েছিলো। কিন্তু—যদিও সম্প্রতি গদ্যে-পদ্যে তিনি প্রচুর লিখছেন—সে-রকম আর হ'লো না। হ'লো না ব'লে আক্ষেপ হয়, কেননা সৌম্যেন্দ্রনাথ বহু পাশ্চাত্ত্য ভাষা জানেন, (রাশিয়ান-জানা বাঙালি ক-জন?) তার উপর উৎসাহী; প্রাদেশিকতাপ্রবণ বাঙালি সমাজে তিনি মূল্যবান মানুষ। এদিকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে এখন মানা অনুবাদে মত বেরোয় ততই ভালো। এমন কি হ'তে পারে না যে এর পরে সৌম্যেন্দ্রনাথ তাঁর কোনো কবিবন্ধুর সহযোগিতায় এ-কাজে অগ্রসর হবেন? এ-রকম যৌথ উপায়ে অনেক অনুবাদ সফল হয়েছে।

বু. ব.

আলো-আঁধারি, রণেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী। এক টাকা

ছোটো বই। লেখক বিষ্ণু দে পড়েছেন, সুধীন্দ্রনাথ পড়েছেন, ছন্দে ভুল করেন না, এবং মাঝে-মাঝে পরিচ্ছন্ন স্তবক লিখতে পারেন। যেমন—

সুরভি, তোমার গন্ধের স্রোত বেয়ে
হৃদয় হোলো যে অগম পথের নেয়ে
যেখানে ঝরছে স্বপ্নের যত ফুল।

কিছুদিন আগে অধিকাংশ নতুন লেখকের গদ্যকবিতায় ঝোঁক ছিলো, সম্প্রতি পদ্য ফিরে আসছে। এটা সুলক্ষণ।

মন্তব্য

সাহিত্যে রবীন্দ্র-পুরস্কারের নিয়মাবলী দেখে আমার একটা কথা মনে পড়লো। ১৯৩১ বা '৩২-এ কোনো-এক প্রকাশকের দোকানে একজন প্রবীণ নামজাদা সহৃদয় সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার দেখা। তিনি আমাকে জিগেস করলেন, 'তুমি এখন কী করছো?' আমি বললাম, 'লিখছি।' 'তার মানে বেকার?'

প্রবীণ সাহিত্যিকের এই কথাটি আমি কখনো ভুলিনি। বাংলাদেশে বই লেখাকে কাজ বলে না, আজও বলে না। সাহিত্যিক মানেই বেকার। বেকার মানেই ভদ্রলোক নয়। ভদ্রলোক যে নয় সে তো গণ্যমান্য হ'তেই পারে না। রবীন্দ্রনাথ গণ্যমান্য ছিলেন অন্যান্য কারণে, সাহিত্যিক ব'লে না। 'কথা ও কাহিনী ছাড়া রবিবাবুর কোনো বই পড়িনি।' যাঁর মুখে শুনেছিলাম, নাম বললে সবাই চিনবেন।

এই বেকারের দলকে আবার পুরস্কার! কালে-কালে কতই শুনবো! তা বাপু একটা প্রাইজ-ক্রাইজ নেহাৎ দিতে হয় তো দাও, কিন্তু পৈতেটা দেখে নিয়ো। কিছু-একটা কৌটিল্যিক না-থাকলে কী ক'রে বুঝবো যে একটা জংলিকেই ধ'রে আনলে না? অন্তত দু-জন মহামহোপাধ্যায়ের সুপারিশ যার পকেটে নেই, তাকে যেন দোর থেকেই হাঁকিয়ে দেয়। আরে বাবা বকশিষ কি সোজা!

বকশিষ ব'লেই এ-সব কুশ্রী শর্ত গজাতে পেরেছে। সাহিত্যবোধ থাকলে বই 'দাখিল' করার কথাই হয়তো উঠতো না। বই দেশে কতই বেরোচ্ছে, তা থেকে বাছাই করাটাই বিচারকমণ্ডলীর কাজ।

সাহিত্য-পুরস্কারে সাহিত্যবিষয়ক শর্ত শুধু থাকতে পারে। বলা যেতে পারে এটা কবিতার জন্য, কি উপন্যাসের, কি সাধারণভাবে কল্পনাপ্রবণ সাহিত্যের জন্য। সময়ের বা ভাষার সীমায় আবদ্ধ করা যেতে পারে। কিন্তু এমন কোনো শর্ত হ'তে পারে না, যাতে উমেদারির দুর্গন্ধ।

দশজন সাহিত্যিক মিলে দৈনিকপত্রে এর যে-প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তার পরে আর একটি কথা বলার আছে। কোনো-কোনো সাহিত্যিক বা সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্র-পুরস্কার ভাণ্ডারে চাঁদা দিয়েছিলেন। যখন দেখা গেলো এই পুরস্কারের শর্ত সাহিত্যের, সাহিত্যিকের এবং সাহিত্যিকের মতে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির পক্ষেও গ্লানিকর, তখন সেই চাঁদার টাকা তাঁরা ফেরৎ চাইলে কি অন্যায় হয়?

বুদ্ধদেব বসু

কবিতা

একাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা চৈত্র ১৩৫৬ ত্রৈমাসিক সংখ্যা ৬৯

চীনে কবিতা

আমার পিতৃব্য রাজগ্রন্থাগারিক ইউন-এর বিদায়-ভোজে

আহা সেই যৌবনের দিন দিয়েছি ছড়িয়ে উড়িয়ে।
কত হাসি কত গান,
বন্ধুমহলে সুশ্রী মুখের জাঁক। আজ হঠাৎ
ফুরোলো গান বুড়ো হলাম বুঝি না বুঝেও বুঝি না।
তবু ফিরে আসে বসন্ত, দেখে মন ভরে আনন্দে।
এখনই, বন্ধু, যাবে?
এসো তবে এই একটু সময় হালকা ওড়াই
সুখের হাওয়ায়। বাইরে চলো।
মুকুল ধরেছে প্লামের ডালে, ডাকছে পাখি,
আনো সুরা, আনো গান।
বিকেলের আলো পাহাড়ের পায়ে লুটোয়,
এসো আর-একটু বেড়াই।
একটু পরেই কেউ আর নেই, অন্ধকার। বাঁশের ঝাড়
কী-চুপচাপ।
রাত কত হ'লো, এবার দরজা বন্ধ করো।

লি পো (৭০১—৬২)

পাহাড়ি পথ

সরু পথ বেয়ে পাহাড়ে উঠলাম,
পাথরে পা কাটলো।
থামলাম না, মন্দিরে চলেছি।
পৌঁছতে দেরি হ'লো।
সন্ধ্যা তখন, অন্ধকারে বাদুড় নড়ছে,
মণ্ডপের ঠাণ্ডায় গা জুড়োলো।
সেখানে ফুল ফুটেছে টগর, মস্ত কলাপাতা হাওয়ায় দুলছে—
আহা, বৃষ্টি-ভেজা।
ভিতরে আঁকা আছেন তথাগত, এসো দেখবে,
ব'লে পুরুৎঠাকুর সঙ্গে চললেন আমার,
আলো এনে তুলে ধরলেন দেয়ালে—
আশ্চর্য ছবি।
মাদুর ঝেড়ে দিলেন নিজের হাতে, আনলেন খাবার,
লাল চালের মোটা ভাত, অড়র ডাল, সঙ্কভ সুন।
খিদে মিটলো।
রাত হ'লো, শুয়ে-শুয়ে একটি পোকার ডাকও আর শুনি না।
চাঁদ এলো আমার ঘরে, শান্ত, সুন্দর।
ভোর হ'তেই বেরিয়ে পড়েছি আবার, ঘুরতে-ঘুরতে
পথের ভুল হ'লো,
এই সুকোই, এই বেরোই, ওঠা-নামার ঘোরপ্যাঁচ
ফুরোয় না।
এদিকে ঘন কুয়াশায়
বেগনি রং ধরলো পাহাড়ে, ছড়িয়ে গেলো সবুজ,
আকাশ থেকে ঝর্নার জলে ঝলমল।
চলেছি পাইনবন পেরিয়ে,

হঠাৎ একগাছের ধার ঘেঁষে—প্রকাণ্ড, দশ জোয়ান
বেড় পায় না।—
নামছি ঝর্নার খরস্রোতে কাঁকর মাড়িয়ে,
হাওয়ায় গান ওঠে ছলছল·· ছলছল।
চলো,
কাপড় ভেজে ভিজুক,
মিলাক আরো দূরে শহর,
প'ড়ে থাক পিছনে আমার আপন দেশ, আমার পুঁথিপত্র,
রাজার কাছে দরবার।
কাজ কিছু শেষ হয়নি, না-ই বা হ'লো,
আমার বাছা-বাছা তুখোড় ছাত্ররা ব'সে থাকবে—
ক-দিন আর থাকবে।
আমি বুড়ো হয়েছি, আমার এখানেই ভালো।

হ'ন ইউ (৭৬৮—৮২৪)

চাঁদের উৎসবে

(সহ-ডেপুটি চাং-কে)

মেঘ স'রে গেলো, ছায়াপথ মিলায়,
হাওয়ার ধার ঝেঁটিয়ে নিলো আকাশ, চাঁদের ঢেউ ফুলে
উঠলো,
বালি মসৃণ, জল শান্ত, শব্দ নেই, ছায়া নেই জ্যোছনায়।
এসো বন্ধু, এই নাও সুরা, আজ তোমার গান শুনবো।
তুমি গান ধরলে—কিন্তু কেমন গান? কান্নার মতো,
আমার দু-চোখ ছাপিয়ে গেলো শুনতে-শুনতে।

'তুং-তিং হ্রদ যেখানে আকাশে মেশে
নয়-সংশয় উঁচু পাহাড়ের চূড়ায়,
যেখানে ড্র্যাগন, হাঙর উঠছে, ডুবছে,
ডাকছে বানর, কাঁদছে উড়োশেয়াল।
ধুকধুক বুকে আঁকড়ে প্রাণ
চাকরিতে আমি পৌঁছলাম,
সঙ্গহীন, শব্দহীন
লুকিয়ে যেন পালিয়ে আছি।
বিছানা ছেড়ে উঠতে ভয়, সাপের ভয়,
খাবারে মেশা বিষের ভয়,
হ্রদের হাওয়ায় রোগের বীজ,
নিশ্বাসে দুর্গন্ধ তার।
কাল শুনলেন জেলার হাকিম
রটিয়ে দিলেন ঢাক পিটিয়ে
রাজত্বের বদল হ'লো ;
সিংহাসনে নতুন এক
সম্রাটের আমল শুরু।
লম্বা ফর্মার ইস্তাহার
ছুটছে রোজ চারশো মাইল,
মৃত্যু যাদের দণ্ড, সবাই
মুক্তি পেলো, নির্বাসিত
ফিরলো ঘরে, চুনোপুঁটির
ফিরলো কপাল, বেহুঁশ ঘুষখোরের দল
এক কলমে বাতিল—
সজ্জনের নাম উঠলো দপ্তরে।
আমার নামও পাঠিয়েছিলেন বড়ো হাকিম,

লাটসাহেব কানেও সেটা নিলেন না,
উল্টে আমায় বদলি ক'রে দিলেন এই
জংলি পচা মফস্বলে।
চাকরি আমার একেবারে নিচু ধাপের,
কী বা হবে নাম ক'রে—
কোনদিন না শুনি আমার শাস্তি হ'লো
চৌরাস্তায় পঁচিশ বেত।
আমার সঙ্গে ঘর-তাড়ানো আর যারা
ফিরছে এবার একে-একে,
সে-পথে পা ফেলার আশা
অসম্ভব স্বর্গ আমার,
অসম্ভব, অসম্ভব।'

দোহাই, গান থামাও, আমার গান শোনো এবার,
অন্য গান, ভিন্ন সুর—আকাশের গান শুনতে পাও না?

'মাঝে-মাঝে চাঁদ যদিও আসে
এমন চাঁদ কি ফিরবে?
কে জানে আবার কবে বসন্ত
এই সৈকতে ভিড়বে।
যদি ঠেলে দাও আজকের সুরা
কাল কি ভরবে পেয়ালা,
কাঁদলে কি আর ভাগ্য ভুলবে,
চলবে সে তার খেয়ালে।'

ঘান ইউ

পাহাড় চড়ার স্বপ্ন

বুক ফুলিয়ে পাহাড়ে চড়ি আমি,
বেরিয়ে পড়ি লম্বা লাঠি হাতে একলা।
হাজার চূড়া, অসংখ্য উপত্যকা,
একটি বাকি থাকলো না, সব ঘুরে-ঘুরে দেখলাম।
ক্লান্তি নেই, জিরোতে হয় না একবার,
জোয়ান পা, নিশ্বাসে যৌবন।
··সব স্বপ্ন, রোজ রাত্রে এই স্বপ্ন দেখি।

কিন্তু কেমন ক'রে?
মন যখন স্মৃতির পথে পিছনে ফেরে
শরীরেও যৌবন আসে আবার?
শরীর কি মনেরই তবে ছায়া?
তাহ'লে কেন শরীর ভেঙে পাত হ'লেও মনের ভেঙ
ফুরোতে চায় না?

না, ছুটোই মায়া।
স্বপ্ন মিথ্যে, বাস্তবও সত্য না।
ছাখো-না দিনে আমার থরথর ক'রে পা কাঁপে,
আবার রাত্রি ভ'রে লাফিয়ে বেড়াই পাহাড়ে।
এদিকে দিন যত, রাত্রিও ততক্ষণ,
তাই দিনে আমার যত লোকশান, রাত্রে ঠিক ততটাই
আমার লাভ।

পো চু-ই (৭৭২—৮৪৬)

গাছ ছাঁটা

ঠিক আমার জানলাটারই সামনে দেখি
গাছের সারি উঁচু হ'লো, পল্লবে পুরন্ত ডাল,
হায় দূরের পাহাড় তাতে আড়াল—
ফাঁকে-ফাঁকে ঝিলিক দিয়েই লুকোয়।
সেদিন আমি কুড়োল নিয়ে বেরোলাম,
এক-এক কোপে এক-এক ঝোপ সাবাড়।
কত হাজার পাতা ঝরলো গায়ে মাথায়,
হাজার চূড়া হঠাৎ কাছে এলো।
মনে হ'লো মেঘের ঘোর আব্রু ছিঁড়ে
নিঃশঙ্কে মুখ দেখালো নীল,
মনে হ'লো কত যুগের পরে, বন্ধু,
আবার তোমার দেখা পেলাম।
প্রথমে মৃদু হাওয়ার ঢেউ ব'য়ে গেলো,
একে-একে পাখি ফিরলো ডালে।
মনের ভার নামাতে চাই অবাধ নৈঋতে,
চোখের তাক পাহাড়ে, মন—কোথায়।
সত্যি কথা, পক্ষপাত আছেই আছে,
বলো তো কোন ভালোয় কিছু মিশোল নেই।
কচিপাতার সবুজও ভালোবেসেছিলাম,
আরো ভালোবাসি পাহাড়, এইটুকুই দোষ।

পো চু-ই

মৃতা পত্নীকে

বাপের ছোটো মেয়ে, আদরিণী তুমি,
অদৃষ্টের দোষে এই গরিব পণ্ডিতের হাতে পড়লে
আমার ছেঁড়া জামায় চোখ নামিয়ে যখন রিপু করতে,
আমি তোমার মন ভিজিয়ে, আস্তে
দু-একটা সোনার কাঁটা খুলে নিতাম খোঁপার—
মদ কেনা চাই তো।
বুনো আনাজ রাঁধতে
পাতা পুড়িয়ে উনুন জ্বেলে।
আজ শুনছি ওরা সভা ডাকছে, আমার লাখ টাকার ডালি
নাকি তৈরি—
আজ তোমায় কী দেবো তা-ই ভাবি।
তোমার নামে মন্দিরে পুজো? এই?

২

কে আগে মরবে বলো তো? আমি! না, আমি!
কত ঠাট্টা দু-জনে ব'সে করেছি।
একদিন হঠাৎ তুমি চ'লে গেলে
আমার চোখের উপর দিয়ে, তুমি।
তোমার জামাকাপড় সবই প্রায় বিলিয়ে দিলাম,
তোমার শেলাইয়ের বাক্স কখনো খুলি না, সাহস নেই।···
ঝি-চাকর সকলের দিকে তোমার হাত ছিলো দরাজ,
আমিও সেটা রেখেছি, কিন্তু তোমার মতো হয় না।
বৃদ্ধের কথা সত্য, বেঁচে থাকলে প্রিয়বিয়োগ হবেই,
কেউ নিস্তার পায় না;

তবু বলি, একসঙ্গে আধপেটা খেয়ে দিনের পর দিন যাদের
কেটেছে,
এ-দুঃখ তাদের মতো কি আর কারো।

৩

দুঃখ শুধু তোমার জন্য ?
না, নিজের কথাও ভাবি।
সত্তর হ'তে কত আর দেরি আমার ?
আমি তো ভালো-মন্দয় সাধারণ—
দেখেছি মহৎ মানুষ, কে জানে কার শাপে নিঃসন্তান।
আমি তো চলনসই পদ্য লিখি,
শুনেছি মহাকবির কথা, তাঁর ডাকেও ওপার থেকে
সাড়া দেয়নি ঘরনী।
মৃত্যুর পরে মিলন ?
বিশ্বাস করি না, তুমিও কোনোদিন করোনি।
সেই অন্ধকারেই শেষ, আর আশা নেই, জানি।
তবু
রাত্রি ভ'রে চোখ মেলে তাকিয়ে
আমি দেখতে পাই
তোমার মেঘলা কপালে
তোমার সমস্ত জীবনের সংসার চালাবার
দুশ্চিন্তা।

য়ুআন চন (৭৭৯—৮৩৯)

অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু

মন্তব্য

আপাতত বাদ দিলে, প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য অন্য কোনো কবিতার সঙ্গে চীনে কবিতার কিছুই মেলে না। আমরা যাকে বলি বড়ো ভাব, বড়ো বিষয়, চীনে কবিতায় তা নেই, আমরা যাকে বলি গভীরতা তাও না। আবেগ, সংরাগ, আকৃতি, ভক্তি, কামুকতা, এর প্রত্যেকটি বর্জন ক'রে এই কবিতা তার স্বকীয়তায় আশ্চর্য ফুটে আছে। গতানুগতিও দুই ক্ষেত্রে বিভিন্ন। বিশ্ব-কবিতার একটি বিরাট অপাঠ্য এবং একটি উৎকৃষ্ট বড়ো অংশের যে-দুটি বিষয় অবলম্বন, সেই প্রেম আর কাম, কিংবা ঐশ্বরিক আর যৌন প্রেম, এখানে অনন্য-রূপে বিরল। এ-দুয়ের সাক্ষাৎ পাই চীনে কবিতার আদিপর্বে, কিংবা দূরতর লোকগাথায়। খৃঃ পূঃ ৫০০ সালেরও আগেকার নাম-না-জানা গেঁয়ো কবির একটি গীতিকা তুলে দিচ্ছি

হাটের পথে চলতে গিয়ে
যদি তোমার আঁচল ছুঁই,
রাগ কোরো না :
সে-সব কথা কেমন ক'রে ভুলি।

হাটের পথে চলতে গিয়ে
যদি তোমার হাতেই হাত রাখি,
রাগ করবে—?
সে-সব দিন ভুলতে পারি না তো।

জন্মমৃত্যুর রহস্য বা স্রষ্টার মহিমা নিয়ে দু-একজন আদিকবি যাঁরা ভেবেছেন, তাঁদের মধ্যে চাং হং (খৃঃ পূঃ ১৩৯-৭৮) সম্বন্ধে কিংবদন্তী এই যে গণিতে জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিলো, কিন্তু তাঁর নামে প্রচলিত কবিতা অন্য কারো লেখা। তা রচনা যাঁরই হোক, 'চুয়াং জু-র অস্থি' কবিতার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃতিযোগ্য :

আমি এখন ইন আর ইয়াং-এ ভাসছি
প্রকৃতির সঙ্গে মিশে, প্রকৃতিই আমার স্বভাব,
স্রষ্টা নিজে এখন আমার বাবা, আমার মা,
আকাশ আমার বিছানা, মাটি আমার বালিশ,
বজ্র আর বিদ্যুৎ আমার ডঙ্কা আর পাখা,
সূর্য চন্দ্র আমার প্রদীপ, আমার বাতি,

আমার পাহাড়ি ঝরনা হচ্ছে মেঘ আর আকাশগঙ্গা,
আকাশের তারা আমার মণিমুক্তা।
প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেছি আমি।
বাসনা নেই, লিপ্সা নেই,
ধুয়ে আমাকে সাফ করতে পারবে না,
নোংরা ক'রে ময়লা করতে পারবে না আমাকে,
আমি কোথাও যাই না তবু ঠিক পৌঁছই,
ব্যস্ত নই, তবু দ্রুত।

(অনুবাদ—অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'কবিতা', পৌষ ১৩৫২)

অনেকটা হিন্দুভাবাপন্ন এই কবির সঙ্গে তুলনীয় চাং হং-এরই সমসাময়িক ওয়াং ইয়েন-শু (আনুমানিক ৬৩০ খৃঃ)। এঁর 'বাঁদর' কবিতার আরম্ভ :

আশ্চর্য মহান তিনি, অসম্ভব তাঁর উদ্ভাবন,
যিনি এই আকাশের বিস্ময় বানালেন, পৃথিবীর ইন্দ্রজাল।
অলোকে সেই শক্তি, যিনি কত ক্ষুদ্রকে
কত গোপন সুন্দর ক'রে গড়লেন, সকলের মধ্যে সঞ্চারমান।
ছাখো এই বাঁদরটাকে, ধূর্ত, ছোট্ট এইটুকু,
কদাকার ; মুখটা কুঁকড়োনো যেন বয়োবৃদ্ধ,
এদিকে শরীর যেন বাচ্চা খোকার।···

এ-সব কবিতায় যে-প্রবলতা পাই, বিখ্যাত পরবর্তীদের সুপক্ক কারুকর্মে তা লুপ্তপ্রায়। এর কুললক্ষণ পৃথিবীর অন্যান্য কবিতারই অনুরূপ ; এখানে চীনে কবিতাকে মনে হয় সংস্কৃত বা লাটিন বা ইংরেজি বা বাংলা কাব্যেরই সধর্মী। কিন্তু চীন-সভ্যতার বিকাশকালে কবিতার আকাশ-যাত্রা বন্ধ হ'লো, এই উদার উচ্চারণও টিকলো না। এর কারণ অনেকে বলেন এপিক কাব্যের অভাব। চীনেদের রামায়ণ মহাভারত বা ইলিয়াড ওডেসি নেই, নাটকও দেখা দিয়েছিলো মাত্র তেরো শতকে। ইওরোপে বা ভারতে, যেখানে এপিক থেকে নাটকের এবং নাটক থেকে গীতিকাব্যের জন্ম, সেখানে গীতিকাব্য আবেগে আন্দোলিত, অলংকারে সমৃদ্ধ, নাটকীয় কথনভঙ্গিতে শতবিচিত্র। চীনে কবিতায় ও-সব গুণ কিছুই বর্তালো না, তার পরিণতি হ'লো একেবারে অন্য পথে। আট-নয় শতকে

বহুবিশ্রুত তাং বংশের রাজত্বকালে তার পূর্ণপ্রস্ফুটিত স্বরূপ দেখতে পাই। দুটো লক্ষণ প্রথমেই চোখে পড়ে: বিষয়বস্তু সংকীর্ণ, অলংকার—আমাদের অভ্যস্ত অলংকার—অতিবিরল। বিষয়ের মধ্যে বন্ধুতা, বন্ধুবিচ্ছেদ, অন্যতম। বন্ধু মানে বঁধু নয়, পুরুষের পুরুষ বন্ধু। মনোবিজ্ঞানী সমাজবিজ্ঞানীর কাছে এর যা ব্যাখ্যা হবে তা সহজেই অনুমেয়, কিন্তু কবিতার পক্ষে তা অবান্তর। তাছাড়া কবিতামাত্রেই কিছু-না-কিছু মামুলি, প্রচলিত সমাজ-বিধানে বাঁধা; পারসিক সাকিও নবকিশোর—যদিও ওমর খৈয়মের বাংলা সংস্করণে তার মেনকামূর্তির ছড়াছড়ি—শেক্সপীয়রের সনেটও অধিকাংশ এক রূপবান যুবার স্তুতিবাদ। এখানে কথাটা এই যে উপলক্ষ্য যা-ই হোক, কবিতাটা খাঁটি কিনা। পিতৃব্যবিরহে কাতর হ'য়ে কোনো বাঙালি কবির সাত পুরুষে কেউ কবিতা লেখেনি, কিন্তু সি পোর কবিতাটিতে আমরা উপলক্ষ্য ভুলে যাই, তাঁর দরজা বন্ধ করার শেষ দীর্ঘশ্বাসটি আমরাও ফেলি—এখানেই কবি জিতে গেলেন। চীনের উজ্জয়িনী-যুগের এই রীতি, বন্ধু বিনে গীত নেই, দুঃখ মানে বন্ধুর বিদায়, বন্ধুর মুখদর্শন সুখের উদাহরণ। ব্যতিক্রমস্বরূপ এজরা পাউণ্ড রিহাকু-র (৮ শতক) দু-একটি রঙ্গ উদ্ধার করেছেন, রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের প্রসাদে সেভেন সওদাগর-বৌয়ের বিস্ময়কর বিরহলিপি আজ অনেক বাংলা পাঠকও পড়েছেন। মৃতা পত্নীর স্মরণে য়ুআন্ চন-এর খেদোক্তিও এমনি আর-একটি প্রথাচ্যুত বিষয়।

দ্বিতীয় বড়ো বিষয় চাকুরিজীবীর আক্ষেপ, বদলির বিড়ম্বনা, নির্বাসনের দুর্ভোগ। পুরোনো চীন কবিরা প্রায় সকলেই ছিলেন 'ডেপুটিজাতীয় জীব'; শুধু তা-ই নয়, সিবিল সার্বিস পরীক্ষায় নির্দিষ্ট বিষয়ে পদ্যরচনা তখন আবশ্যিক ছিলো। এতে যেমন মামুলি পদ্যে দেশ ছেয়েছিলো, তেমনি সুবিধেও ছিলো এইটুকু যে সৎ কবিকে সমাজে একঘরে হ'তে হয়নি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জনকরাও অনেকে ডেপুটি, তাছাড়া বর্তমান ফ্রান্সের দু-জন মুখ্য কবি, ক্লোদেল আর সাঁ-জন পের্স, রাজদূতের কর্ম করেন, কিন্তু কর্মজীবন আর কবিজীবন উভয়তই একান্ত বিচ্ছিন্ন। চীন সভ্যতার চারিত্রলক্ষণ রাজকর্মে আর কবিকর্মে পরস্পর-সম্বন্ধ, যার ফলে চাকরিটাসুদ্ধ—রাজকবিতার না, হার্দ্য কবিতার বিষয়ীভূত।

আপাতবিরোধী দু-দুয়ের মধ্যে এমন স্বচ্ছন্দ সহযোগ অন্য কোথাও ঘটেনি ; আজ পর্যন্ত চৈনিক রাজপুরুষ সাধারণত কাব্যরসিক, এমনকি কাব্যকার—স্বয়ং মাও ৎসে তুং কবিতা লেখেন।

কিন্তু বিষয় বলতে প্রকৃতিই সর্বস্ব, তাকে বাদ দিয়ে কোনো কথাই বলা যায় না। 'মৃতা পত্নীকে' কবিতায় আকাশ, গাছ কি পাহাড়ের কথা একবারও নেই দেখে অবাক লাগে কেমন ক'রে চীনে কবির হাত দিয়ে বেরিয়েছিলো। যেমন চিত্রকলায়, তেমনি কাব্যে, প্রকৃতির অন্তরঙ্গ সহবাসের চেতনা বিশিষ্ট চৈনিক ধর্ম। এর কোনো জুড়ি নেই। দেশে কালে বিচ্ছিন্ন বিসদৃশ অন্য যত কবির কথাই মনে করি, সকলের কাছেই প্রকৃতি হয় মানবজীবনের পটভূমি, নয়তো উপায়, পথ, কিংবা কোনো বৃহত্তর সত্তার বা বিশ্বসত্তার প্রতিভূ ; প্রকৃতির পিঠে চ'ড়ে অনেকেই 'অন্য কোনখানে' পৌঁছন। কিন্তু লি পো, হান ইউ বা পো চ্যু-ইর প্রকৃতিপ্রেম রাসায়নিক অর্থে বিশুদ্ধ, তাতে অন্য আকাঙ্ক্ষার মিশেল নেই। কুসুম, মেঘ, হাওয়া, এমনকি জড় পাথরেও তাদের প্রণয়ের কারণ এ নয় যে তারা অমৃতের প্রতীক বা ইঙ্গিত—তারা আছে, এবং তাদের নিয়ে আমিও আছি, এই চেতনাতেই তাঁরা আত্মহারা। যদিও প্রাচ্য, এঁরা হিন্দু বা পারসিক ভক্ত-ভাবের নামগন্ধবর্জিত, পরমাত্মায় নিঃস্পৃহ, এঁদের কথা হাফিজের বা বৈষ্ণবের বা গীতাঞ্জলির নয়। হান ইউর পর্বতপ্রেমে কোনো অমর্ত্য ঈপ্সা নেই, তাকে আমাদের খুবচেনা বৈরাগ্য ভাবলেও ভুল হবে। ধর্মভাবের তুলনায় সৌন্দর্য-বোধ এখানে প্রধান, 'তাঁকে' পাবো কি পাবো না তার চাইতে সৎজীবন বড়ো কথা। তাও দর্শনের প্রভাবে শিক্ষিত সমাজের তখন এই আদর্শ ; জ্ঞানী গুণী রাজপুরুষ সকলেই চেয়েছেন মুখর সংসার ছেড়ে দূরে, বনে, পাহাড়ে, সৈকতে, শান্ত নির্মল ভাবুকতায় দিন কাটাতে। ভাবুকতা মানে ধ্যান? না, সুরা চাই, বন্ধু চাই, বীণা চাই। এ-ইচ্ছা শুধু ছবিতে কবিতায় নিবেদন ক'রে তাঁরা ক্ষান্ত হননি, বাস্তবেও প্রয়োগ করেছেন। কবিরা রাজকর্মে ইস্তফা দিয়ে (কিংবা চাকরি খুইয়ে) কতবার যে বনে গেছেন, আবার ফিরেছেন, আমাদের কাছে সে-কাহিনী কৌতুকাবহ।

আধুনিক পরিভাষায় একে বলে এস্কেপিস্ট। ওটা একটা গাল দেবার

বুলি, তাই অর্থহীন। যদি বলা যায় যে কেবলই বাদ দিতে চাইলে কবিতায় বাস্তববোধ ক্ষীণ হবে, আশ্চর্য এই যে এখানে ঠিক উল্টোটারই প্রমাণ পাই। চীনেরাই বিশেষভাবে বাস্তবের কবি, এমনকি সাংসারিকতার; প্রতিদিনের ঘরকন্নার এমন খুঁটিনাটি পৃথিবীর আর-কোনো গীতিকাব্যে মিলবে না। চীনে কবি নির্বস্তুকের বিরোধী, তাঁর আরাধ্য মূর্ত—যাকে বলে কংক্রীট—সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিমাপূজায় তিনি প্রতিশ্রুত। তাই তাঁর প্রকৃতিবর্ণনা একেবারেই যথার্থ, হুবহু চোখে দেখে লেখা, ঠিক যেটুকু দেখা সেটুকুই লেখা। একই কারণে উপমায় তাঁর বিরাগ, উক্তিতেও অনাস্থা। কাব্যের প্রধান উপায় ইঙ্গিত, ইঙ্গিতের উপায় ছবি। চৈনিক চোখে ছবি আর কবিতা একার্থ; তারা ছবি লেখে, কবিতা আঁকে; তাদের বর্ণমালার অক্ষরও এক-একটি ছবি, ভাবচ্ছবি। যেমন ল্যাণ্ডস্কেপে তাদের পাতার পর পাতা কবিতার মতো প্রবাহ, কবিতায় তেমনি দৃশ্যছবির রূপায়ণ। কখনো দেখা যায় দু-চার লাইনে ছবি এঁকেই কবির তৃপ্তি, ছবির পরে কথা নেই, ছবিটাই কথা।

ভিক্টরীয় উচ্ছ্বাসে বিরক্ত হ'য়ে আধুনিক পশ্চিমী মন চৈনিক চিত্রলতায় মুগ্ধ হ'লো। অপূর্ব লাগলো এই কম-ক'রে-বলা কবিতা, গলা চড়ে না, ঘোষণা নেই, কোনো কথায় জোর দেয় না, সব কথা খুলেও বলে না। মৃদু, নিস্তাপ, বিষণ্ণ, এর শক্তি সূক্ষ্মতায়, যাথার্থ্যে, অবিচল পার্থিবপ্রণয়ে। উপমার বদলে বস্তুটারই ব্যবহার, বিবৃতির বদলে চিত্রকল্পের প্রয়োগ, চীনেদের কাছে এই দুই সূত্র শিখে নিয়ে এজরা পাউণ্ড তাঁর ইমেজিস্ট আন্দোলনে কেমন কাজে লাগিয়েছিলেন সে-খবর আজ সকলেই জানেন। শুধু ছবির ইঙ্গিতে কবিতা বলার একটি চরম নমুনা পাউণ্ড পেশ করেছেন তাঁর প্রিয় কবি রিহাকুর আর-একটি শ্রীপুরুষঘটিত রচনায়:

প্রবালসিঁড়ির বিলাপ

প্রবালসিঁড়ি শিশির প'ড়ে-প'ড়ে শাদা,
কত রাত? আমার মসলিনের মোজা শিশিরে ভিজলো,
স্ফটিকের পরদা টেনে দিয়ে
আমি ব'সে-ব'সে দেখি স্বচ্ছ শরৎ, শরতের চাঁদ।

'প্রবালসিঁড়ি, অতএব প্রাসাদ। বিলাপ, মানে নালিশ কিছু আছে।

মসলিনের মোজা, মানে নায়িকা কোনো পুরসুন্দরী, দাসীদের কেউ না। স্বচ্ছ শরৎ, তাই নালিশের কারণ শীতগ্রীষ্ম নয়। নায়িকা অনেকক্ষণ অপেক্ষমানা, কেননা শিশিরে শুধু সিঁড়িই শাদা হয়নি, মোজাও ভিজে গেছে।' এই ব্যাখ্যা দেবার পরে পাউণ্ড বলছেন, 'স্পষ্ট কোনো অভিযোগ নেই ব'লেই কবিতাটি মহামূল্য।'

অনুবাদে ঠিক বোঝা যাবে না ব'লে পাউণ্ডকে টীকা জুড়তে হয়েছে, কিন্তু মূলত যদি এত অল্পেই এতটা বলা হ'য়ে থাকে তাহ'লে আশ্চর্য বইকি। (জাপানি-হাইকা ঠিক এই জাতের না—সেখানে কথাটাও ক্ষীণ।) অবশ্য কাব্যের ভির্যকরীতি সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে; সংস্কৃতে একে বলতো 'ব্যঙ্গ্য' বা 'ধ্বনি', কিন্তু 'লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী' এর তুলনায় বড্ড বেশি ব'লে ফেললো। আড়িতে বলতে চীনে কবির মতো নিপুণ কেউ না; বস্তুত, অন্য কোনো ভাবে বলতেই তিনি অনভ্যস্ত। ফলত, চীনে কবিতায় বৈচিত্র্য কম, এবং কোনো-কোনো মহৎ কাব্যরূপের সম্ভাবনাই নেই; র‍্যাঁবো-র 'মাতাল তরণী', কি 'বলাকা', কি 'ফোর কোয়াট্রেটস' সেখানে অচিন্ত্য। কিন্তু সেখানে যা আছে তাও অন্য কোথাও নেই ব'লে বিশ্বসভায় তার এত সম্মান, তাছাড়া এখনকার তরুণ বাঙালি কবিরা, যাঁরা নতুন পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, চীন সংসর্গে তাঁরা হয়তো সৎপরামর্শ পাবেন।

অন্ধকার

জীবনানন্দ দাশ

('অন্ধকার' কবিতাটি প্রায় সতেরো বছর আগে (১৩৩৯-৪০এ) লেখা হয়েছিল। খুব সম্ভব ১৩৪২ বা ৪৩ এ 'কবিতা'য় দিয়েছিলাম। তখন ছাপানো হয় নি, পরে পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গিয়েছিল। আমার কাছেও কোনো কপি নেই ভেবেছিলাম। পুরোনো খাতা খুঁজতে-খুঁজতে সেদিন বেরিয়ে পড়ল। সতেরো বছর আগের ঠিক সেই মনোভাব এখন নেই আর আমার ; এ রকম কবিতা আজ আমার পক্ষে লেখা সম্ভব নয়।)

গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর ছলছল শব্দে জেগে উঠলাম
আবার
তাকিয়ে দেখলাম পাণ্ডুর চাঁদ বৈতরণীর থেকে তার অর্দ্ধেক ছায়া
গুটিয়ে নিয়েছে যেন
কীর্তিনাশার দিকে।

ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম—পউষের রাতে—
কোনোদিন আর জাগব না জেনে
কোনোদিন জাগব না আমি—কোনোদিন জাগব না আর—

হে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
তুমি দিনের আলো নও, উষ্ণ নও, স্বপ্ন নও,
হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে
রয়েছে যে অগাধ ঘুম
সে আস্বাদ নষ্ট করবার মত শেলতীব্রতা তোমার নেই,
তুমি প্রদাহ প্রবহমাণ যন্ত্রণা নও—

জান না কি চাঁদ,
নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
জান না কি নিশীথ,
আমি অনেক দিন—
অনেক অনেক দিন
অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মত মিশে থেকে
হঠাৎ ভোরের আলোর যূথ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব
বলে বুঝতে পেরেছি আবার ;
ভয় পেয়েছি,
পেয়েছি অসীম ছুনিবার বেদনা ;
দেখেছি রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে
মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাড়াবার জন্য
আমাকে নির্দেশ দিয়েছে ;
আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভ'রে গিয়েছে ;
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শূয়োরের
আর্তনাদে উৎসব সুরু করেছে।
হায়, উৎসব !
হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মত মিশে
থাকতে চেয়েছি।

কোনোদিন মানুষ ছিলাম না আমি।
হে নর, নারী,
তোমাদের পৃথিবীকে চিনি নি কোনোদিন ;
আমি অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব নই।

যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি,
শত শত শূকরের চীৎকার সেখানে,
শত শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর,
এই সব ভয়াবহ আরতি !

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত ;
আমাকে কেন জাগাতে চাও ?
হে সময়ব্রান্তি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি,
হে হিম হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন ।

অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চঞ্চলচঞ্চল শব্দে জেগে উঠব
না আর
তাকিয়ে দেখব না নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরণীর থেকে অর্দ্ধেক
ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে
কীর্তিনাশার দিকে ।
ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব—ধীরে—পউষের
রাতে—কোনোদিন জাগব না জেনে—
কোনোদিন জাগব না আমি—কোনোদিন আর ।

বিভাবরী

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

তোমার চোখে দু'ফোঁটা রাত এতো গভীর
এতো বিভোর ?
নেই যে আর ভোর-দুপুর নেই বিকেল—
তোমার রাত দু-ফোঁটা রাত নিরুদ্বেল—
এমন স্থির !

দু'চোখ-ভরা দু'ফোঁটা রাত এমনও হয় !
কী অদ্ভুত !
দু'জনই যেন দু'ফোঁটা রাত—রাতের কেউ
দু'জনই যেন অন্ধকার—রাতের ঢেউ
আকাশময় ।

তোমার চোখে দু'ফোঁটা রাত ক্ষণিক রাত—
অনেক রাত
অতীত আর ভবিষ্যৎ উধাও তার,
মায়ের মতো তারার রাতে আকাশ-পার
বাড়ায় হাত !

তোমার চোখে দু'ফোঁটা রাত রাতের ঝড়
কালান্তিক !
দু'জন যেন যোজন-ভরা ঝড়ের মন,
দু'জন যেন করেছি কবে মৃত্যুপণ
পরস্পর ॥

পঞ্চবটী

বিষ্ণু দে

'সেখানে প্রতীক্ষারত সুরসুন্দরীরা—' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

তুমিই মালিনী, তুমিই তো ফুল জানি।
ফুল দিয়ে যাও হৃদয়ের দ্বারে, মালিনী,
বাতাসে গন্ধ, উৎস কি ফুলদানি,
নাকি সে তোমার হৃদয়সুরভি চাওয়া?

দেহের অতীতে স্মৃতির ধূপ তো জ্বালিনি।
কালের বাগানে থামে নিকো আসাযাওয়া,
ত্রিকাল বেঁধেছ গুচ্ছে তোমার চুলে,
একটি প্রহর ফুলহার দাও খুলে,

কালের মালিনী! তোমাকেই ফুল জানি,
তোমারই শরীরে কালোত্তীর্ণ বাণী,
তোমাকেই রাখী বেঁধে দিই করমূলে,
অতীত থাকুক্ আগামীর সন্ধানী—
তাই দেখে ঐ কাল হাসে দুলে' দুলে'

এখানে ঢেকো না সূর্য, এখানে যে একটি হৃদয়
দুহাতে শীতের রৌদ্র ছড়িয়েছে অনেক—আমারও
জীবনের মাঠে-বাটে নদীপথে পাথরে বাগানে
প্রাণের আরাম আলো ছড়িয়েছে, সে প্রসাদ কারো
আকাশে আনেনি ছায়া, নির্বিশেষ সে হৃদয়দানে
তুলাদণ্ডে রাখেনি সে দাবীদাওয়া ভীরু বিনিময়—

যদিই বা রেখে থাকে, তবু তার হৃদয়ের আলো
ফুলে ফুলে প্রজাপতি, কিম্বা বুঝি ফুলেরই প্রতিমা,
সূর্যঘট ছেয়ে তার বর্ণচ্ছটা যেন ইন্দ্রধনু,
হরধনুর্ভঙ্গে নয়, বরদা সে, ঐশ্বর্য বিলাল
হাসিতে ভঙ্গীতে মিত্রাক্ষরে তার, তার স্বচ্ছ তনু,
বিরহে যা রৌদ্র নয়, মানি, কিন্তু ঝুলনপূর্ণিমা।

কি জানি তোমাকে হয়তো বা ভুল জানি,
তবু প্রকৃতিতে রূপায়িত মনপ্রাণ।
সে ছবিতে এক হয়ে গেলে তুমি, রূপকে,
হৃদয় সংবেদনে ভরে' দিলে গান।

হয়তো বা ভুল, বৃদ্ধে কিম্বা যুবকে
তোমার কোমল হাতের সঠিক বাণী
বুঝবে, আমি কি শুনেছি নিজেরই ভাষা?
আকাশে মাটিতে জীবনে যে কানাকানি
মনে মনে শুনি সে কি শুধু অনুমান?

জানি না, তোমাকে হয়তো বা ভুল জানি।
তোমার জীবনে দিগন্ত পটভূমি
শুক্লপক্ষ কতোদিন দেবে তুমি
সে জানো তুমিই, আমার রাতের আয়ু
নাক্ষত্রিক, নিত্য সেখানে বায়ু
আলো উত্তাপ—আর অতন্দ্র প্রাণ।

এখানে নতুন পাতা, সাইরেনে সাইরেনে
আর এক বছর এল রাত্রি ভেঙে বারোটায়।

কে জানে স্থবির সময়ের দুরন্ত ছোটায়
পরাগ ওড়ায় কে ও! কিইবা হবে তা জেনে?
উদ্বৃত্ত কুড়াই, কালের স্কুলের বাগানের
মালিক বা মালীর দাক্ষিণ্যে, মালিনী গেয়ালে
যা দেয় দুহাতে নিই, বাঁধি গতির দেয়ালে।
দান যদি ঝরে, থাকে রেশ কালের গানের,
ছবি থাকে।

হে কাল হে মহাকাল। তাই চাই
আনন্দে মর্মরে সাধারণ্যে দুঃখী সুখী দিনে
দৈনন্দিন তোমাকেই। ভবিষ্যের উৎস স্থির,
অতীত তো বনভূমি, পূর্বাপরে জীবনের তৃণে
চাই না খোদাই ঝর্না সুরসুন্দরীর নৃত্যে।
কিম্বা চাই, মূর্ত ইতিহাসে ত্রিকালেশ্বরীর
গতির ত্রিভঙ্গ তীব্র পঞ্চবটী এই চিত্তে।

পঞ্চবটী ডাকে আজ পান্থজনে, উদ্দাম উধাও
কালের যাত্রার ধ্বনি শোনা যায়, হাওয়ার মর্মরে
শৈশবের হাসি ছোটাছুটি কলরব আজ পাও
শুনতে কি পাও কিছু কালের পাথরে

নতুন ব্যঞ্জনা? আজ প্রতীক কি প্রত্যক্ষ নির্ঝরে?
হেমন্তের দোলা পেল নিদাঘের স্তম্ভিত সন্তাপ?
দম্পতি—চালশে আর বাইশেও প্রেমের প্রতাপ
মেনে আসে পদচারে অসঙ্কোচ ইতস্তত সবুজবাসরে,

সাইরেনের পরে স্নাত শ্রমিকেরা শুভ্র অবসরে,
নানারঙা ভিড়ে ঘাসে সুরসুন্দরীর পাশে নানান্ বিন্যাসে।

গুঞ্জিত বৃদ্ধের মতো, যারা আসে রৌদ্রের প্রত্যাশে
মাথায় জড়ানো গল্প সেকালের দূর অভিশাপ

দিনে দিনে সন্ধ্যায় সকালে বৎসরে বৎসরে
কালের প্রাচীন মূর্তি হাসে তারা সাবেক অভ্যাসে ?
মালিনী ! দেখেছ ঐ খেলার মেলায় কাল সম্পূর্ণ সন্ন্যাসে
আকণ্ঠ তৃপ্তিতে হাসে, খেলেনা ও সাপ !

তোমার মালাটি আজ নিয়ে যাব আমাদের ঘরে ।

১৩০০ সালের নায়কের বিলাপ

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

দেয়ালে বসুধারার আঁক...দুপুরে দোলে মন—
প্রহর আজ প্রহার কী যে করেছে সারা খন।
তোমাকে মনে পরেছে মনোরমা—
অনেক দূরে যেখানে চোখ—আকাশ ছিলো নীল,
সেখানে মিছে আজকে খুঁজি তোমারি কোনো মিল—
হারানো সেই তনুর তাপ স্বপ্ন সুধু নিয়ে
দড়িতে ঝোলে তোমার পরা জামা
দুপুর ধ'রে তাই তো ধরি তোমাকে মনোরমা
দেয়ালে বসুধারার আঁক.. দুপুরে দোলে মন—
প্রহর আজ প্রহার কী যে করেছে সারাখন
দেয়ালে বসুধারার আঁক করে না আজ ক্ষমা—

অনেক কথা অনেক দিন ফিরিয়ে আনে প্রাণে
থেমেছে সুর বহুদিনের গানে
আজকে সারা দুপুর ভ'রে কোথাও গতি নেই
পাথর যেন কোথাও প্রাণ নেই
স্তব্ধ সব, গাছের পাতা মাটিতে হ'লো জমা—

ধূসর তাকে যেখানে থাকে একটি ঘষা আয়না
গন্ধ তেল, আলতা-ছুটি চিরুনিখানি ভাঙা
স্মরণে রোদ মলিন হ'লো কিসের ক্ষীণ স্বর—
হঠাৎ যেন চকিত হ'লো ঘর!
কয়টি কাঁটা চুলের ফিতে কুঙ্কুমের শিশি
বাড়িতে করা গরিবিয়ানা সাবান তেল দিশি

রয়েছে প'ড়ে সেখানে আজ ধূলোর পুরু স্তর,
দুপুর কাঁপে আবেগে থরোথর !
এ নয় মিছে মনন আজগুবি
তোমাকে ভেবে দুপুর হ'লো বড্ড বেশি ছবি,
আবেগ আজ মানে না তাই কোলন আর কমা—
চোখের জলে যে-তর্পণ তাতে কি করা চলে
জীবনটাকে যে-ক্ষতি দিয়ে ভরেছো মনোরমা ?

Ozymanadias-এর নব পর্যায়

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

শুষনি নদীর বাঁকে শুনেছি প্রবাদ
দুপুরে পথিক পেলে রক্ত শুষে খায়
তপ্ত মরু, ধূ ধূ বালি, মাঠ, ধূলিমুঠি
ধ'রে খালি দুপুর ওড়ায়।
কোথাও বসতি নেই—সবুজের লেশ
শুষনির বাঁক সব চুষে চুষে করেছে নিঃশেষ।
কিছুদূরে বাড়ি ছিলো আজো তার থামেরা দাঁড়ায়—
শতাব্দীর জরা নিয়ে রুগ্ন ছায়া সিকতায় ফেলে
মুমূর্ষুর মতো হাঁকে —এ-পথে কে যায় ?

এ-ছায়া শ্যামল ছিলো একদিন পাতার সবুজে।
সে-সবুজ পালিয়েছে বহুদিন দূর কোনো মাঠে,
সরস মাটির কোলে হয়তো বা পেয়েছে আশ্রয়।
কয়টি থামের আড়ে ফেলে গেছে ক'টি ছায়া—করুণ ছলনা।
যারা আজো ঊর্ধ্বমুখী জিভ মেলে মেঘতৃষ্ণায়

অবেডায়া সবুজের এক ফোঁটা আস্বাদ তবুও কি
তবু কি পেলো না ?

মেঘডায়া মিছে খুঁজে আকাশের বুকে পেতে চায়—
সে-সবুজ নেই বটে তবু সেই সবুজের স্মৃতি
প্রেত হ'য়ে আজো ঘোরে এ-দগ্ধ চড়ায়।
সিমুমের ফুৎকারে ধূলিমুঠি তুপুর ওড়ায়
শতাব্দীর জরা নিয়ে বালুডাঙা এই মরুমাঠে
বাড়ি নয়, ভগ্নজানু থামেরা দাঁড়ায় !

জীবনের যে-রহস্য সময়ের গূঢ় পরিণাম,
এই সব জরাজীর্ণ থাম—মনে হ'লো এরা সব জানে
পাদপীঠে উৎকীর্ণ কয়ছত্র রয়েছে সেখানে :

গাত্রলিপি

ভন পাম্ব এই হর্ম্ম্য উৎপত্তি কখন
ঊষর প্রান্তর যেথা আছিল যখন
ঘোষণা রাক্ষসী ছিল নদী হৈল যেথা
স্বয়ং বরুণ দেব পাইয়া বারতা
কাকচক্ষু দিঘি এক সাগরের প্রায়
করিতে আদেশ দিলা দাশরথি রায়ে
দাশরথি রায় রাজা প্রবল প্রতাপ
ইন্দ্রতুল্য বৈভব কেবা করে মাপ
স্থাপিলা বিলাস ধাম নন্দন-কানন
উদ্যান মধ্যে তেঁই করিলা খনন
কাকচক্ষু সরোবর পরম শোভন
বরুণে দিলেন ভার করিতে রক্ষণ
আয়তনে হৈল দিঘি সাগরের প্রায়
প্রবল প্রতাপ রাজা দাশরথি রায়

নিষ্কর্ম্মা শিল্পী দিল্লা করিতে পত্তন
পঞ্চশত দিগা ভেই হৈলা ভস্মাসন।
ইতি। শুভ বঙ্গাব্দ—১১০০শো সন।

প'ড়েই চমকে উঠি
পাশ দিয়ে দ্রুতবেগে কেউ ছুটে যায়—
আচমকা দু'চোখ ফেরাই
ভয়ে ভেঙে যায় স্বর তবুও চ্যাঁচাই—
কে? কে! কে ছুটে পালায়!
ফের ভালো ক'রে পড়ি লেখা আছে এগারো শো সন
১৩৫৭ বুঝি ব্যঙ্গ ক'রে যায়!

শুষ্‌নি নদীর এই রক্ত-চোষা বাঁক
সারাদিন কী যে ভাবে আদি ঝড়ে বালির মুকুরে,
দুপুরে পথিক পেলে রক্ত চুষে খায়—
কোথায় উদ্যানবাটী, কোথা রাজা দাশরথি রায়
শেষ ফোঁটা সবুজের ভস্মশেষ নিয়ে
দলে দলে পিপাসার্ত অণু উড়ে যায়—
জটিল জটলা ফেঁদে বুঁদ হ'য়ে দুপুরের রোদে
কী ভেবে যে ভগ্নজানু থামেরা দাঁড়ায়?
অবিশ্রান্ত ধূলিমুঠি কেনই বা দুপুর ওড়ায়?

কলকাতায় প্রেম

রাজলক্ষ্মী দেবী

এই মহানগরীর প্রেম
এই মহানগরীর মতো
জটিল, উদ্বিগ্ন, অস্থহীন।
নিঃশেষ হ'লেও তবু নিশ্চিহ্ন হয় না।
এই মহানগরীর প্রাণ,
এই মহানগরীর প্রেম।

কলকাতা, আমি তোমায় ভালোবাসি,
তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

একদা মিলনে ছিলে সহজ সুযোগ।
ছিলো মহানগরীর বিপুল বিস্তৃতি,
যানবাহনের অভ্যর্থনা।
ছিলো লেক—তীর্থের মহিমা নিয়ে।
বটানিক্স—চৈত্রের চিড়িয়াখানায়
নির্জন দুপুর।
সুখসুবিধার লোকলোচনের করে না পরোয়া
মহানগরীর মন, এই
মহানগরীর প্রেম।

কলকাতা, আমি তোমায় ভালোবাসি
তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

এই মহানগরীর প্রেম
এই মহানগরীর মতো
অধীর উত্তেজনার বুদ্বুদ।

নেই তার রাখালী প্রেমের অবিচ্ছেদ পরমায়ু।
তা নিয়ে চলবে না অভিযোগ।
এ গঙ্গায় চলবে না হায় বাঁশি ভেঙে ভাসিয়ে দেওয়া।
কবিতা তোমার প্রেম ছাড়িয়ে বাঁচবে,
প্রেম হারিয়ে বাঁচাবে।

আহা, ক্ষয় হয়ে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম, হায় রে।
মহানগরীর শতচঞ্চল স্নায়ুর কাঁপন সাহসী ভয়ে
নতুন কিছুর অপরিচয়ে।
হাজরার মোড়ে কতো যে কেঁপেছে চোখের ইচ্ছা—এবং শঙ্কা
ট্রামবাসভিড় ট্রাফিকনিয়মে,
চপল ভ্রমর ব্যর্থ হ'য়েই ঘুরে-ঘুরে ওড়ে,
এলো না আমার সময় এলো না।
হায়রে হাজার মুখের মধ্যে সেই চেনামুখ
কোথায় কোথায়—
হায় ভীরু প্রেম হায় রে!

দেখাশোনার দরজা বন্ধ,
অতএব খিড়কির আশ্বাস, কবিতা।
মনে-মনে ভাবা, নম্র, জটিল, না-লেখা কবিতার মতো
এখনো স্পন্দিত হয়
এই মহানগরীর দিন
মহানগরীর প্রেম।

কলকাতা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

দুরন্ত দুপুর

নরেশ গুহ

এই দুষ্টু হাওয়া নিয়ে কত আর পারি ?
সামান্য গল্পের বই, সেও যেন রহস্যের শাড়ি,
পিঠ ঢাকা এলো চুল, ভয় ঢাকা কার বুক ঘিরে
শান্ত হয়ে শুয়ে আছে ! কপট ছলনা নিয়ে ফিরে
তাই তার বার-বার আসা চাই থেকে তাকে-তাকে
পাতা এলোমেলো ক'রে কখন পালাবে এক ফাঁকে।
কিছুই হয়নি যেন ! তার যেন মন প'ড়ে আছে
সাত-বাসি খবরের কাগজের নর্তকীর নাচে
মলিন গলির রোদে। ঘুরে-ঘুরে পাড়ায় পাড়ায়
হঠাৎ কখন এসে কপাটের আড়ালে দাঁড়ায়,
নরম আঙুলে নাড়ে ঘামেভেজা কপালের চুল।
অবুঝ মনকে বলি এখনো বোঝোনি তুমি ভুল ?
সিঁড়িতে নরম চটি, বারান্দায় কার ঠাণ্ডা স্বর
কেন মিথ্যে শোনো তুমি ?

তবু ঘুরি এ-ঘর ও-ঘর ;
ছাদের সিঁড়িতে থামি, নেমে এসে ঢকঢক খাই
কোণের কুঁজোর জল। অসতর্ক অভ্যাসে দাঁড়াই
বিবর্ণ আয়নার পাশে।—কী তন্ময় স্নিগ্ধ চোখে চায়
শূন্য ঘরে শঙ্খশাদা এ-কঠিন দেয়ালের গায়ে
যামিনী রায়ের ছবি এ-জীবনে যা আছে জানার,
যত শোক যত সুখ, কান্নার করাতে যত ধার ;
যে-যে ঘাসে যে-যে রং, হৃদয়ের যতটা উগ্রতা
জানা চাই সব জেনে, পরম নির্বাকে শেষ কথা
উচ্চারণ করে তার তৃপ্ত চোখ—'শান্তি হও মন।'

—আমি ভাবি জীবনের এ-ইস্কুলে বাজবে কখন
শেষ ঘণ্টা ? কবে আমি শেষ লেখা লিখে দিয়ে শ্লেটে
সন্ধ্যাতারা গুনে-গুনে নদীর পাড়ির পথ হেঁটে
বাড়ি যাবো ? ব'সে-ব'সে হাই ওঠে, ঘুমে চোখ ভরে।

দুপুরে দুরন্ত হাওয়া মনে পড়ে, কাকে মনে পড়ে ?

হাওয়ার হাঁস

নরেশ গুহ

তোমাকে আমি কী নদী দেব, কী সর ?
দীঘির ধারে বনের আড়ে
শ্যামল শিশু যে-গাছ বাড়ে
তোমায় দেব তার উন্মত্ত
লাল পলাশের কেশর।

যে-হাওয়া নাড়ে পাতারে তার
ঢেউয়েরে করে সাপের সাঁতার
শিশির কাড়ে যে-হাওয়া তার ফুলে,
উড়াল পাখির ঝাঁকে মিশে
বিদেশ বেড়ায়, গমের শীষে
শীত ঝরায় মেঘের চাদর খুলে :
পুব পাহাড়ে কাঠের ঘরে
সরাল হাঁসের বালির চরে
হাওয়ার সে-চর পাঠাবো শত শত,
আকাশতলে যা-কিছু ধরে
ঘাসের ঘরে তারার ঘরে

আনবে খুঁজে তোমার মনোমতো।
দিন জুড়াবে ঝিঁঝির গানে
হাওয়ার হাঁস ঘরের টানে
খবর ঠোঁটে ফিরবে ঝাঁকে-ঝাঁকে,
তখন মায়ের কোলে ঘুমোয়
ক্লান্ত শিশু শান্ত চুমোয়
নীল কুয়াশা বেড়ায় গাছের ফাঁকে।

বসন্তের শেষ

মৃণালকান্তি

১

পিঙ্গল ধূসর আলো দীর্ঘশ্বাস-কণ্টকিত দিন।
একে-একে ঝ'রে গেছে বসন্তের পালক রঙিন।
পিপাসিত পুষ্পবীথি, তাম্রবর্ণ বৈশাখের বন।
উড়ে যায় অবিশ্রান্ত সময়ের পাখি উদাসীন!
অলক্ষিতে স্বপ্নের প্রহর শেষ সহসা কখন;
জীবন রয়েছে শুধু, ভ্রষ্টলগ্ন জীবনের বেলা!
ধূ-ধূ শূন্য সময়ের মরুভূমি, স্তব্ধ ব'সে আছি—
বিষণ্ন মনের রৌদ্রে ঘোরে ম্লান স্মৃতির নৌমাছি।

২

এইখানে কী গভীর স্তব্ধ কালো রাত,
দিগন্তবিলীন ধূ-ধূ বিস্মৃতি অপার।
মেঘের ঘুমন্ত দেশে তুমি যেন চাঁদ,
তোমার হৃদয়ে নীল আকাশ-বিহার।

বেঁধেছ অনেক দূর স্বপ্নলোকে বাসা,
নির্জন বাতাসে কাঁদে আমার পিপাসা।
হৃদয়শাখায় ঝরে শীতের প্রহার,
এই ছায়া পাতা ফুল পথের ধূলার !

কতোকাল

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

কতোকাল হ'লো, এখানে তো তুমি আসো না ;
এলোমেলো ঘরে ছড়ানো মনের অগোছালো আশা-বাসনা !
তুমি বলেছিলে শেষে সব স'য়ে যাবে
তোমার দুঃখ বুকে তুলে নিতে দু'হাত বাড়াবে কাল,
হাসবে সকাল শিশুর মতন তোমার জানালা ধ'রে
সব ক্ষতি মুছে সোনারোদ দেবে
তোমার উঠোন ভ'রে।

গেয়ো পার হবে দুঃখ আমার
শীতের শিশির বিঁধবে বুকের হাড়ে
আকাশ চাবে না নীলচোখে
কোন বস্ত্র হানবে দৈব,
বুকে হাত চেপে সইবো সে, ভালোবাসা !

এই ছড়া বেঁধে বোঝাতে চেয়েছি মন সে-তো নয় ফেলনা,
হাট ঘুরে তোরে এনে তো দিয়েছি আধ্যাত্মিক খেলনা ;
যতদূরে থাক মনে-মনে সে-তো
মনেরি মতন রইবে,

মাটির দেয়ালে হানা দেয় আজ
তবু কোন দুর্দৈব !

উত্তর হ'তে হাওয়া দেয় আর দক্ষিণ তোলে খিল,
আনীল আকাশে ছলছল করে মৃগনয়নের ছলনা—
কে তারে বাঁধলো বলো !
প্রহর এখানে ধূসর, কেবল সবুজ মাঠের ছায়া
এখানে ছড়ায় গৃহস্থালির মায়া ;
ধুলো ঝেড়ে মুছে পাতো সংসার, কেউ করো ঘরকন্না ।
হায় রে অবুঝ কন্যা,
কতো কাল হ'লো, এখানে তো তুমি আসো না
নির্জন ঘরে ছড়ায় মনের
অগোছালো আশা-বাসনা ।

অব্যক্ত

প্রবোধচন্দ্র পাল

তোমারে পেয়েছি আমি ।
এই আবির্ভাবে
আমারে বিহ্বল করে বাণীর অভাব ।
পারি না, পারি না
তোমারে জানাতে অভ্যর্থনা
পরিস্ফুট ব্যঞ্জনায় ।
রুদ্ধ স্বর,
অভিভূত আমার আকুতি ।

এই ত্রুটি
যদি পারো, প্রিয়তমা,
ক্ষমা করো।
শুধু ক্ষমা?
আরো। হানো তুমি, এই অন্তরাল
তুমিই ঘুচিয়ে দিয়ে দূর করো জড়তার কঠিন জঞ্জাল।

আশঙ্কায় দোলে মন, তবু আশা আছে।
প্রিয়, এই অন্ধকারে দৃষ্টির ছুয়ারে
তোমার নিঃশব্দ পদপাত
উন্মুক্ত স্বর্গের প্রান্তে বার-বার ডাক দিয়ে যায়।
সে-স্বর্গ ক্ষণিক। যে-আঘাত
ব্যক্তির সীমানা ভেঙে সুখদুঃখ অতিক্রম ক'রে
আশ্চর্য নূতন বাঁকে জীবনের দেয় সার্থকতা,
কবিতায় দীপ্ত হয় দৈনিক তুচ্ছতা
সে-আঘাত হানো।
এই নীরবতা
অসহ্য আমার। কথা বলো,
তুমি কথা বলো—আমারে বলাও।
তোমারে এখনো
পেয়েও পাইনি, এই বঞ্চনার পুঞ্জিত মূঢ়তা
দূর হ'য়ে দেখা দিক বাণীর পূর্ণতা।

পাথেয়

শঙ্খ ঘোষ

এমনো যে দিন ছিলো না তা নয়
যখন তোমার চলনে
কতই ঝরেছে ঐতিহাসিক ছলনা।
এমনো সময় ছিলো না তা নয়
যখন তোমার গর্ব
ভেবেই পাইনি কয়টা বিশ্বে ধরবে।
জানি না এখনো সেই সব খেলা
তেমনি করো কি করো না,
যত ব'সে ভাবি, শুধু মনে পড়ে
তোমার চোখের করুণা।

'কবিতা'র জন্য

মণীন্দ্র রায়

বুদ্ধদেববাবু ছিলেন কলেজ-দিনে শিক্ষক
বারো বছর আগে ; কাব্য লিখছি সেই ইস্তক।
বুড়ো নই যে স্মৃতিকথায় টানব মিষ্টি আমেজ ;
বড় কবি নই, লেখনে আনব চারিত্র্য তেজ !
তবু যখন জানিয়ে দিল সম্পাদকের টীকা
এই বছরেই উঠে যাবে 'কবিতা' পত্রিকা,—
কী খারাপ যে লাগল, আহা, এ প্রিয়-বিচ্ছেদ,
চাপতে গিয়েও বেরিয়ে এল পুঞ্জীভূত খেদ !

জানি বটে রবীন্দ্রনাথ পঞ্চদশীর নামে
গান লিখেছেন, ('কবিতা' তাই ঐ অঙ্কেই থামে ?)
ও-সংখ্যাটা চাঁদের পক্ষে ষোলো কলার সাক্ষী,
প্রতিষ্ঠানের বেলায় সেটা অলক্ষুনে বাকি্য !

ইতিহাসকে চিনি এবং কালের নিয়ম জানি ;
প্রয়োজনের শেষনোড়ে তার থাকলেই হাতছানি ।
সাহিত্যেরও দায়িত্বে যে স্থায়িত্ব নেই, সত্য—
যদি না তার কালের সঙ্গে ঘটে ঐকমত্য ।

'কবিতা'র কি এল সে-ধন বনবাসে যাবার,
বাংলাদেশে এ-আন্দোলন দিন করেছে কাবার ?
স্বকালচেতন নয় কি-না সে জানি অন্য তর্ক,
মানব না কো নেই 'কবিতা'র ইতিহে সম্পর্ক ।
আজও দেখি অনেক লেখক নক্স করে কাব্য
'কবিতা'তেই, বলব মাঝে রয়েছে সম্ভাব্য
নতুন কবি, (প্রতিভার তো আকাল ! লেখে ক-জন ?
এ-গোষ্ঠী যা লেখেন, ও-দল করেন সবই বর্জন !)
মতামতের দলাদলি, কানাগলির চক্রে
সানন্দে ডাক দিই 'কবিতা'র নতুন লেখকবর্গে ।
সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, সার্থক কি বৃথা,
বাংলাদেশে বেঁচে থাকুক কাব্য আর 'কবিতা' !

নিজের অতীত দিনের স্মৃতি—সেই 'কবিতাভবন',
আজকে যাঁরা মহৎ, তাঁদের আলাপী গুঞ্জন,
কত কবির লেখায়-লেখায় সুস্থ প্রতিযোগিতা—
মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় পুরোনো সেই 'কবিতা' !

বুদ্ধদেববাবু, আপনি পঞ্চদশের শেষে
নিজের হাতের সৃষ্টি কি আজ দেবেন নিরুদ্দেশে ?
'প্রাপ্তে তু ষোড়শে' পুত্র জানেন তো হয় মিত্র !
চোখের সামনে রাখুন এঁকে সেই আগামীর চিত্র ॥

AN INDIAN DAY

Noel Scott

I watched a bullock sway
Away from the sun-stained day
Towards the night,
And saw the tight, the bright
Quivering dry size of its thighs
Fade in the dust of a road in India.

I watched a leper squat,
Rot by the very spot
Where the beast
Had laid like a priest its feast
Before the adoring eyes of the flies
Riding the dust of a road in India.

I watched a woman cry,
Lie in the gutter and die,
Her moans,
Thin like the stones of her bones,
Drift to the rusted rise of the skies
High above the dust of a road in India.

Such was the common day.
Say it is far away—
Yes ;
But not the less confess
That hot in the dust of a road in India
A terrible prize, a destiny, lies.

সমালোচনা

বন্দে মাতরম, নিশিকান্ত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, ৮৲

নাম শুনে যা মনে হয় তা নয়; ভারতমুক্তির উপলক্ষ্যে দেশমাতৃকার বন্দনা নয়। পাতা উল্টিয়ে যা মনে হয় তাও নয়, দুর্গা, কালী কিংবা অন্য কোনো কাল্পনিক দেবীর স্তবগান নয়। পণ্ডিচেরির আশ্রমবাসী এবং ভক্তমণ্ডলী যাঁকে 'শ্রীমা' বলে থাকেন, বইটি একান্তরূপে তাঁরই বন্দনা। এ-তথ্য বাইরে থেকে জানতে হয় না, কবিতাতেই তা বলা আছে।

মর্তিয়া জীবনে তব যেথা তুমি জগতের যোগীন্দ্রসঙ্গিনী।
জগন্মাতা শিব-সীমন্তিনী!
তব অভ্রান্ত-দেশে কে তোমারে বলে বিদেশিনী (পৃঃ ৩)

'বিদেশিনী' শুনে অন্য পাঠকের হয়তো ধাঁধা লাগবে, কিন্তু তিনি যদি ধৈর্য ধ'রে প'ড়ে যেতে পারেন তাহ'লেই পরিষ্কার সব বুঝতে পারেন।

এবার পুরায় দ্বিভুজার রূপে ভারতী দক্ষিণ বে
বেঁধে দক্ষিণ ভারত-সিন্ধুপারে
দেবী ভগবতী মানবীতনুর রূপে
যাহে যোগ বলে পার্থিবতার পথে
মহা দুর্গতি নিবারণের অভিযান,
যোগেশ্বরীর অবিচল সাথী অবতার-ভগবান
যোগীন্দ্র-অরবিন্দে মূর্তিমান! (১৯ পৃঃ)

এর পর আর কোনো সংশয় থাকে না।

এ ক্ষেত্রে শুধু ভক্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য বেরোলেই এই গ্রন্থপ্রকাশ সার্থক হ'তো। কিন্তু না, বইটির লক্ষ্য পাঠকসাধারণ, তিন টাকা মূল্যও ধার্য করা আছে। তাহ'লে মনে করা যেতে পারে যে গোষ্ঠীগত বক্তব্য বাদ দিয়ে রচনারই কিছু মূল্য আছে—বিশেষত কবি যখন নিশিকান্তের মতো একদা-শিল্পনিপুণ? 'দিগন্তরেখা দ্বিখণ্ড করি' দাঁড়িয়েছে তালতরু'-র মতো কোনো ছবি, বিড়ালের চোখে 'তিমিরদীর্ণ সূর্যহীরকে'র মতো কোনো দ্যুতির বিস্ময়—অন্তত কোনো পংক্তিপ্রসাধনের নৈপুণ্য? একেবারে কিছুই পাবো না তা কি হ'তে পারে?

কিন্তু কিছুই পেলাম না। অনেক-পাতা-জোড়া লম্বা কবিতা, তার কোনো-কোনোটি সংস্কৃত ছন্দে গুরুগম্ভীর, মোটা-মোটা কথায় আর প্রকট অন্ত্যপ্রাসে সযত্নবিন্যস্ত সেই সঙ্গে গানের আকারে ছোটো কিছু রচনা, কিন্তু সমস্তটাই বাগাড়ম্বর, শুধু উচ্ছ্বাস, বস্তু কিছু নেই।

এস মা দুর্গা এস দুর্গতি জগতের গতি নাশিনী,
এস অখিলের তমোগহ্বরশর্বরী-উদ্ভাসিনী,
এস সুবর্ণা
দেবী অপর্ণা,
স্বর্ণ-তপন-হাসিনী! (১১ পৃঃ)

যম মলিনমানসলীন মুন্ময়ত। মাঝে
সুন্দর-তারা-পারাবারের যুগল-মণি রাজে,
কত কালের সুপ্তি টুটি' চেতন ওঠে জাগি'
দীপ্ত পরশনে। (৩৮ পৃঃ)

বেছে-বেছে অপেক্ষাকৃত সহনীয় দুটি অংশ উদ্ধার করলাম। প্রথমটির বিষয়ে কিছু না-বলাই ভালো, দ্বিতীয়টির শেষ দু-লাইন রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিসহ না'লেই সুখকর।

ওরে আয়রে, তোরা আয়,
তোরা আয় আয় আয়,
মায়ের সোনার কমল কলার বেলা যায় যে বয়ে' যায়।
(২০ পৃঃ)

'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'র পর এও লেখার প্রয়োজন ছিলো না। ভূমিকায় প্রকাশক জানিয়েছেন যে 'শ্রীঅরবিন্দের দিব্য স্পর্শে' নিশিকান্তের কাব্য বর্তমানে 'অপরূপ রূপ' নিয়েছে। 'অপরূপ' কথাটা হয়তো ভেবে-চিন্তেই বসানো হয়েছে, হয়তো তার অর্থ এই যে এই কাব্যের নিগূঢ় আধ্যাত্মিক মর্মে পৌঁছতে না-পারলে পাঠক যেন নিজের অক্ষমতাকেই সে-জন্য দায়ী করেন। আধ্যাত্মিকতায় কারো মনোপোলি আছে কিনা জানি না, কিন্তু এটা জানি যে কাব্যের আবেদন তার নিজস্ব, যার ফলে নাস্তিকও 'গীতাঞ্জলি' প'ড়ে অভিভূত হয়েছেন, এবং ইএটস-এর উত্তর-কবিতা ভালোবাসতে হ'লে সেই সঙ্গে অলৌকিক তত্ত্বেও বিশ্বাসী হ'তে হয় না। আলোচ্য গ্রন্থে নিশিকান্তের কবিকণ্ঠ যদি কোথাও শুনতে পেতাম, তাহ'লে এ-ক্ষেত্রেও তাই

হ'তো ; যারা শ্রীঅরবিন্দকে অবতার ব'লে মানে না, কিংবা অবতারবাদেই মানে না, কাব্যের কারণেই একে তারা মূল্য দিতেন। কবিত্বের এই মোহিনী শক্তি নিশিকান্ত 'অলকানন্দা' পর্যন্ত কোনোরকমে টেনে রেখেছিলেন, কিন্তু—গভীর দুঃখ নিয়েই বলছি—এখানে তা একেবারে অনুপস্থিত। হয়তো কোনো-এক স্বচ্ছ মুহূর্তে নিজেই তা বুঝতে পেরে তিনি একটি 'পরিচয়'-পত্র লিখেছেন :

আমারে করিয়ো ক্ষমা, হে পাঠক, হে সমালোচক !
তোমাদের তরে আমি আনি নাই শ্রবণ-রোচক
সুরের ঝংকারধারা, স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত আর
অক্ষরবৃত্তের ছন্দে গ্রন্থিবাঁধা শৃঙ্খলালংকার।

এই স্তবকটিই একটু বদলে লিখলে গ্রন্থের পরিচয় ঠিক যথার্থ হ'তে পারে :

আমারে করিয়ো ক্ষমা, হে পাঠক, হে সমালোচক !
তোমাদের তরে শুধু আনিয়াছি শ্রবণ-রোচক
ছন্দের ঝংকারধারা, হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরমালা, আর
অসংকৃত অনুপ্রাসে গ্রন্থিবাঁধা শৃঙ্খলালংকার।

কোনো মতবাদের পৈতে নিলে শক্তিশালী কবিত্বও অধঃপতন হ'টে থাকে এ-কথা যাঁরা প্রমাণ করতে চান, তাঁদের পক্ষে 'বন্দে মাতরম' পরম উপযোগী উদাহরণ। তবে হয়তো অন্য অনেকের মতো নিশিকান্তর পতন এমনিও হ'তো, স্বভাবতই পুঁজি ফুরোতো, কিন্তু 'দিব্য স্পর্শে'র প্রভাবে উল্টোটাই তো উচিত ছিলো ?

রবীন্দ্র-সংগীত : শান্তিদেব ঘোষ। ৪৲
স্বরবিতান : ৬, ৭, ৮, ৯। প্রত্যেকটি ২৷৷০ } বিশ্বভারতী
নৃত্য : প্রতিমা দেবী। ৩৲

সাময়িক পত্রাদিতে বিচ্ছিন্ন আলোচনা ১৯৪১-এর পর থেকে অনেক হয়েছে, কিন্তু এ-বিষয়ে গ্রন্থ এখনো 'রবীন্দ্র-সংগীত' একমাত্র। সাত বছর আগে প্রথম বেরিয়েছিলো, নতুন সংস্করণে গ্রন্থের পরিধি আরো ব্যাপক, আকার প্রায় দ্বিগুণ। লেখক শুধু গানের আলোচনাতেই ক্ষান্ত হননি, নৃত্য এবং নাটকের বিষয়েও বলেছেন, তার উপর তাঁর স্মৃতিকথার পুঁজিও বড়ো কম না—এই সব বহুবিধ কারণেই এ-বই মূল্যবান। পরিশেষে নির্দেশিকা বা ইনডেক্স দেখতে পেয়ে সুখী হলাম ; ও-বস্তুটির অভাবে বাংলা বইয়ের যথাযথ ব্যবহারে প্রায়ই বিঘ্ন ঘ'টে থাকে।

'স্বরবিতানে'র খণ্ড ক-টিতে 'বসন্ত', 'ফাল্গুনী', 'প্রায়শ্চিত্ত', এই তিনটি নাটকের সমগ্র স্বরলিপি প্রকাশিত বা পুনর্মুদ্রিত হ'লো, ১৩২৯-এ নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ-করা 'বসন্তে'র পুরো পুঁথিটাই ছাপানো আছে। অষ্টম খণ্ডের উপাদান তিরিশটি ব্রহ্মসংগীত—রবীন্দ্রনাথের দুর্লভতম রচনা। 'সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে/শোনো শোনো পিতা/কহো কানে কানে শুনাও প্রাণে প্রাণে/মঙ্গল-বারতা' কিংবা 'সংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার,/ নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই' রবীন্দ্রনাথ কেমন ক'রে যে-কোনো বয়সে লিখতে পেরেছিলেন আমরা তা ভেবে পাই না। ব্রহ্ম-সংগীতের শ্রেষ্ঠাংশ বোধহয় চারের খণ্ডেই গৃহীত হ'য়ে গেছে, অবশ্য 'আঁধার রজনী পোহালো' এ-খণ্ডেরই অন্তর্গত। স্বরলিপি করেছেন নানা সময়ে নানা জন; 'বসন্ত' পুরোটা দিনেন্দ্রনাথের, আটের খণ্ড ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীর, অন্যান্যদের মধ্যে শৈলজারঞ্জন, অনাদিকুমার আছেন। স্টার থিয়েটারে একদা-দেখ-ভাসানো 'তোমায় নতুন ক'রে পাবো ব'লেই হারাই ক্ষণে ক্ষণ'-এর স্বরলিপি শ্রীমতী দাহানা দেবীর রেকর্ড অবলম্বনে রচিত।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের বিস্ময়লোকে এখনো খুব আনাগোনা শুরু হয়নি। 'নৃত্য' এ-বিষয়ে প্রথম বই। বিস্তারিত আলোচনা নয়, কাঠোরভাবে টেকনিক্যালও বলা যায় না, স্মৃতিকথাও অনিবার্যতই এসেছে। বইটি তাই সহজেই উপভোগ্য। কিন্তু 'শ্যামা'র কোনো উল্লেখ নেই ব'লে অসম্পূর্ণ লাগলো। ত্রয়ী নৃত্যনাট্যের মধ্যে সর্বাঙ্গীণ বিচারে কেউ কারো কাছে যায় না, কিন্তু কোনো-কোনো দিক থেকে 'শ্যামা'র অনন্যতা সুস্পষ্ট। 'শ্যামা'র বিষয়ের পার্থিবতা পরম, তাই তো নায়িকার ঐ নাম। ভারতীয় ঐতিহ্যে ট্র্যাজেডি নেই, রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাবেও তা ছিলো না, ট্র্যাজিক উপপ্লব এবং চিত্তশুদ্ধির আস্বাদ যদি তিনি কোথাও দিয়ে থাকেন, সম্ভবত —'মালিনী' বাদ দিয়ে—তা শুধু এখানেই। আশা করি ভবিষ্যতে কোনো সুযোগে প্রতিমা দেবী 'শ্যামা' নিয়েও আলোচনা করবেন।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা নাচের ভঙ্গির কয়েকটি ছবি 'নৃত্যে'র অন্যতর আকর্ষণ। মনোরম বহিরঙ্গন, উপহারের উপযোগী।

বু. ব.

দিগন্ত, শ্রীমৃণালকান্তি। ২য় সং, কবিতাভবন।

শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি দাসের এই কাব্যগ্রন্থটি ১৩৫১ সালে প্রথম যখন বেরোয়, তখন 'কবিতা'য় এর সমালোচনা হয়েছিলো। নতুন সংস্করণ পরিবর্ধিত, সুদৃশ্য, এখনকার অঙ্গে দামেও সস্তা। কবিতাগুলি মধুর বিষণ্ণ

সুরে একতারার ঝঙ্কারের মতো, এই রুক্ষতার যুগে বিশেষভাবে উপভোগ্য। কিন্তু কবি হঠাৎ পদবীবর্জন করলেন ?

পত্র

'VERNACULAR'

'কবিতা' সম্পাদক সমীপেষু,

সবিনয় নিবেদন,

যখন দেখি মাতৃভাষা নিয়ে হৈ-চৈয়ের অন্ত নেই, অথচ তার নামকরণে পুরোনো আমলের অপমান থেকেই গেলো, তখন 'কবিতা'র দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষায় এখনো মাতৃভাষার নাম Vernacular। এই ইংরেজি কথাটার সাধিকর ভারতীয় ইতিহাস সকলেই জানেন, তার উৎপত্তির কলঙ্ককথাও সকলেই জানেন। সংস্কৃত 'বর্ণ' শব্দের আত্মীয় ল্যাটিন verna থেকে এর উদ্ভব। Verna = দাস (home-born slave), vernacular = দাসভাষা, বিজিত জাতির ভাষার অর্থে রোমকসমাজে ওর ব্যবহার হ'তো।

আজকাল সকলেই দেখছি বাংলা ভাষার ভালোবাসায় উচ্ছল। আমাদের সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, নেতারা—সকলেরই শিরঃপীড়া ডাকে নিয়ে। পরিভাষা উদ্ভাবন, বানান বর্ণমালার সংস্কার, মুদ্রণ আর টাইপরাইটারের উন্নতি—সবই নাকি জরুরি দরকার। পরীক্ষার খাতাতেও পাংক্তেয় হ'লো, এদিকে রেডিওতে ঘন-ঘন 'আ মরি বাংলা ভাষা'র উচ্ছ্বাস। তবে কি সত্যি আমাদের কপাল ফিরলো এতদিনে ?

না! কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে বাংলা ব'লে কোনো ভাষাই তো নেই, ওটা একটা vernacular, বর্বরের বোল। তুচ্ছ একটা দাসভাষা নিয়ে এত কিসের মাথাব্যথা। আরো আশ্চর্য এই যে কথাটার ব্যবহার সারা দেশে এখন আর-কোথাও নেই, সরকারে না, কোনো প্রতিষ্ঠানে না, কোনো সংবাদপত্রে না, আছে শুধু কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়, যেমন পাটনায় বা যুক্তপ্রদেশে, তাঁরাও 'হিন্দী' বা 'আধুনিক ভারতীয় ভাষা' ব্যবহার করছেন। শুধু এই বিকল্পকুলীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কপালেই Vernacular-এর পঙ্কতিলক আজও বিরাজমান।

পণ্ডিত নেহরু তাঁর আত্মজীবনীতে এ-বিষয়ে বেশ কড়া ক'রেই বলেছিলেন (P. 452, Ed. 1937) ; সম্প্রতি—হয়তো তাঁরই প্রভাবে—কত কটুগন্ধ কথার উচ্ছেদ হ'লো, Asiatic-এর বদলে Asian পেলাম, কুলির বদলে মজদুর। শুধু কি কলেজ-ক্লোয়ারই কালো হ'য়ে থাকবে ? অন্তত ছাত্রছাত্রীদের তো আত্মসম্মান আছে! ইতি

নিরুপম চট্টোপাধ্যায়

THE WISDOM OF AN ANCIENT SAGE
RENDERED BY A MODERN MASTER

CONFUCIUS

The Unwobbling Pivot & The Great Digest
translated with notes & commentary by

EZRA POUND

Handsome Indian Edition Rs. 2/8,-
Published for
KAVITABHAVAN
by
ORIENT LONGMANS LTD.

17, Chittaranjan Avenue Calcutta 13
Nicol Road, Ballard Estate, Bombay
36A, Mount Road, Madras.
Also available at Kavitabhavan.

QUARTERLY **NINE** TWO SHILLINGS

The Spring number is devoted to

CONTEMPORARY VERSE

Contributors include *Ezra Pound, H. D., Marianne Moore, Richard Eberhart, Kathleen Raine, Charles Madge, Ronald Bottrall, Basil Bunting, H. G. Porteus, David Gascoyne, Kathleen Nott, Bro. George Every, S.S.M., C. H. Sisson, Ronald Duncan, G. S. Fraser, John Heath-Stubbs, Sidney Goodsir Smith, Kenneth Gee, Howard Griffin, Michael Hamburger, Maurice Carpenter* and others. Also articles on the poetry of *Roy Campbell & Stephen Spender.*

Edited and published by
PETER RUSSELL. 114 Queens Gate, London, S.W. 7
Annual Subscription : U.K.8/8 (post free) : U.S. $2 (post free)

কৃত্তিবাস

পঞ্চদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা বৈশাখ ১৩৫৭ ক্রমিক সংখ্যা ৩৫

জল দাও

বিষ্ণু দে

ফাল্গুন আরম্ভে তার —
এক হিসাবে অবশ্য মাঘেই,
কিম্বা তারো আগে,
ও বছরে—বা আর বছরে
বছরে বছরে দীর্ঘ প্রকৃতির কর্মসূত্রে অথবা নিয়মে
ছোটো খেয়া মাটির সংযমে
হাওয়ার মূর্ছনাতে গাঁথা সরস সজল সকরুণ গম্ভীর
গন্ধের আলাপ তার বাজে
পাপড়িতে পাপড়িতে তার পরাগের পাখোয়াজে

এ বছরে বর্ষার সজল মিছিলে
কিম্বা তারো আগে বুঝি পাঁচ বছরের দীর্ঘ দূর অভিযানে
প্রাণের প্রয়াসে আজ প্রচুরতা তার
তাই আজ
যখন আকাশে নামে নির্জন বিষাদ
অন্ধকার পুরোনো শিমূলের জালে
গোলমোরের সোনাও পাণ্ডুর
শালিকের ঐক্যতান থেমে যায় জামরুল বাগানে

কলকাতার কাক আর সমুদ্রের বকের বলাকা বন্ধুত্ব
তখনই কুঁড়িতে লাগে অধরা আবেগ কোন্
বসন্তবাতাসে লাগে সহিষ্ণু হৃদয়ে ধরোধরো
প্রচণ্ড যন্ত্রণাস্পন্দে একাগ্র নির্দেশে
আনন্দে নিমেষহীন রূপান্তরে সৃষ্টিতে আকুল

তারপরে আলো জ্বালি
বন্ধু কিম্বা বইয়ের আশ্রয়ে
কিম্বা খবর শুনি দাঙ্গার কোথাও ক্লান্ত
সন্ধ্যার প্রান্তরে এসে নিঃস্বার্থ আকাশে দেখি
ফুটে আছে শান্ত শুচি
সময়ের জড়ো করা ভুল একটি মুহূর্তে ধুয়ে
বিনীত পদ্মের মতো নিশ্চিন্ত অথচ দান্ত
কর্মের সম্বিতে স্তব্ধ
অভ্রান্ত সম্পূর্ণ সত্তা
রাত্রির নক্ষত্রে যেন প্রকৃতিস্থ অস্তিত্বের আকাশে স্বাধীন
একরাশ শাদা বেল ফুল।

গরমে বিবর্ণ হ'ল গোলমোরের সাবেক জৌলুষ—
রুক্ষচূড়া চোখে আনে জ্বালা
রৌদ্রের কুয়াশা জ্বলে ঝরা মরা পোড়া লেবানমে
এখানে ওখানে দেখ দেশছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কের ধারে শানে পথে পথে গাড়িবারান্দায়
ভাবে ওরা কি যে ভাবে! ছেড়ে খোঁজে দেশ
এইখানে কেউ বরিশালে কেউ কেউ বা ঢাকায়

গরম হাওয়ায় ঝরে নীল আর বেগ্‌নি ফুরুষ
কৃষ্ণচূড়া নির্নিমেষ টেনে চলে টেনে মালাবদলের পালা
খুঁজে' খুঁজে' যমুনার স্নিগ্ধ ছায়া হিংস্র গরমে
এখানে ওখানে দেখ কতো ঘরছাড়া লোক ছায়ায় হাঁপায়
পার্কে ছাউনিতে পথে ম্যানসনের বারান্দায় শানের শয্যায়
কি যে ভাবে ঘর ছেড়ে খোঁজে বুঝি দেশ
কোথায় যে যাবে ভাবে হাওড়ায় নাকি সে ঢাকায়

আমাদের ঘরে ঘরে আমরাও নানান মানুষ
গেয়ে চলি চুপি চুপি আমাদের পালা
কিম্বা গাই না আর মাথা নাড়ি পোড়া মাথা গরমে নরমে
থেকে থেকে হয়তো বা আমাদের কেউ কেউ মরীয়া হাঁপায়
জীবনে মৃত্যুতে কিম্বা মৃত্যুতে জীবনে ভগ্ন ব্যর্থ অসহায়
কি যে ভাবে কর্মহীন অর্থহীন অচেনা স্বদেশ
কোথায় যে যাবে ভাবে কোন্ দেশ শীতল বর্ষায়

কারণ দেখেছ সব গোটা মরুভূতে এক যাত্রা কতো সহাস পুরুষ
যাত্রী অভিযাত্রী চলে দেখেছে তো তুষারের দেশে জয়মালা
গলায় দুলিয়ে চলে বিজ্ঞানের মৈত্রীর মরমে
মানুষের প্রেমে বীর দক্ষমেরু কিম্বা দক্ষ মধ্য এশিয়ায়
গমের ধানের ক্ষেতে প্রাণের আশ্বিন আনে স্টেপে ও তুন্দ্রায়
বিজয়ী বসতি আনে সচ্ছল বসতি আনে উন্মুখর দেশ
কতো চেলিউস্‌কিন হাওড়ায় চাটগাঁয় বাঁকুড়ায় চলেছে ঢাকায়

হয়তো বা নিরুপায়
হয়তো বা বিচ্ছিন্নের যন্ত্রণাই বর্তমানে ইতিহাস
বালিচড়া মরা নদী জলহীন পায়ে পারাপার

অথচ বৈশাখী হাওয়া বাংলার সমুদ্রের
আমের মুকুলে ফল
রাশি রাশি বেলমল্লিকায়
বাগান বিহ্বল আজ কালেরই বাগান
তবু লুব্ধ রুদ্রের মাঘের
পাতাঝরা পাতাঝরানোর ক্ষোভের রাগের
তবু সেই বাঁচার-মরার মরীয়া যন্ত্রণা চলে
আমাদের দিনের শিকড়ে রাত্রির পল্লবে

যদি বা হতুম ফুল, বইতুম দক্ষিণের হাওয়া
রইতুম নিষ্পলক রূপান্তরে ধ্রুত নিত্য চাঁদ
কিন্তু আমরা যে পৃথিবীর আমরা মানুষ
আমাদেরই অতীতের স্রোতে গড়ি ভবিষ্যৎ
একূলে ওকূলে আমাদেরই বর্তমানে
কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও—বৃষ্টি কিম্বা আর্তেসীয় জলে।

কর্মিষ্ঠ যন্ত্রণা না হ'লে বলব তীক্ষ্ণ প্রতীক্ষায়
আততির আবর্ত সেতুতে ঘেঁষাঘেঁষি
আমাদের উত্তরাধিকার আমাদেরই ক্রতুকৃতমের
প্রাত্যহিক পদক্ষেপে
আমরা কোপাই গাঁথি বুনি আর আমরাই ভানি
নিজে নিজে এবং সবাই যদি মানে নই
দিই নিজে নিজে কিম্বা সবাই বেশি কেউ কম
সদসৎ তার নিজের সবার কম কেউ বেশি

আমাদের ইতিহাস মুহূর্তে মুহূর্তে গোণে
তরঙ্গিত আয়ু তার জীবনে মৃত্যুতে

আমাদের জীবিকায় জীবনযাত্রায় দেহমনের বিন্যাসে
কর্মে অপকর্মে কর্মহীনতায়—কিছুটা উদ্বৃত্ত সত্ত্বেও
এক পাত্র জল জ'মে যেমন বরফ পাত্রটি ফাটায়

এবারে উঠেছে হাওয়া, ধোঁয়া নেই, দোলা দেবে চাঁদ
চৈত্রের সন্ধ্যায় হাওয়ায় হাওয়ায়
নাকি কোনো দোলাই দেয় না সে ?
পূর্ণিমার চাঁদ বটে, বাঁধ ভেঙে তবু কি সে হাসে
প্রকৃতি কি অপ্রাকৃত মূঢ়তায়
হাসবে কি একাই নিষাদ ?

নির্বাক নিমেষহীন সন্ধ্যা পূর্ণ চাঁদের মায়ায়
হেমন্ত বিষাদ এ কি বসন্তে এনেছে ?

তবু সন্ধ্যা চৈত্র সন্ধ্যা সমুদ্রের শান্তি বিষ
দগ্ধ দিনে মৃত্যুর শহরে
তবুও পূর্ণিমা আসে পথে ছাদে প্রত্যক্ষ কায়ায়
ডুবিয়ে দিনের ছায়া কূট দুর্বিষহ
ভেঙে দিয়ে অঙ্ক বিসম্বাদ
উন্মাদের ব্যবসাও
চূর্ণ করে গৃধ্নু দানবিক হিংস্র কণ্ঠ

হয়তো বা শুনিনিকো হাসি
তোমার, পূর্ণিমা, তবু আমি শুধু খুঁজিনি বিষাদ
সোনালি চাঁদের এই নীল নির্বিকার আলোর বন্যায়
বরঞ্চ শুনেছি দেশে দেশে লক্ষ্মীমন্ত সচ্ছল সুঠাম

গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে, বিস্তৃত শান্তির বর্ষা।
দেখেছি সবাই যেন ভাসি
ছুলি যেন জ্যোৎস্নায় সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে, নদী কিম্বা
আলোর ঝর্নায়
আকাশের সমতলে মৃত্যুও যেখানে পুত্র ও কন্যায়
সম্পূর্ণ বার্ধক্যে স্থির মানসিক যেখানে বাঁচাই আর
বাঁচানোই স্বাভাবিক।

হয়তো বা যন্ত্রণাই সার
দেখে যেতে হবে আজ ঠেকে শিখে
সন্তার অক্ষরে লিখে লিখে
অত্যাচারে অনাচারে উদ্ভ্রান্ত উন্মাদ এই বর্তমান
নিজে নিজে এবং সবার কৃতকর্মে শুনে যেতে হবে
কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম যেন কিম্বা সেই বিরাট প্রাসাদে
অজ্ঞাতবাসের বীর বৃহন্নলা অর্জুনের গান

কিম্বা যেন ফাল্গুন চৈত্রের প্রস্তুতির
পাতাঝরা নতুন পাতার আঁকশিতে অঙ্কুরে
শিরায় শিরায় শিকড়ের প্রচ্ছন্ন উৎসবে
অধরা অথচ তীব্র প্রাণের স্তুতির
অনিবার্য যতির সুকৃতা
শ্রুতির আক্ষেপস্পন্দে
কবিতার ছন্দের মতন
কিম্বা যেন উত্তোলিত পদক্ষেপে
যখন সামনে দেখি সেতুর ফাটলে
অতলের প্রত্যাখান এবং আহ্বান

কিম্বা বুঝি মোহানার গান
হুগলীর নিস্তরঙ্গ সঙ্কীর্ণ মধ্যাহ্নে
পিছনে অনেক স্মৃতি বহুস্রোত
রূপনারায়ণের
দামোদর কাঁসাই চলদি রসুলপুরের
দূরের মাৎলা মাথাভাঙা আরো দূরে পদ্মার বাঁধের।

অথচ নিঃস্রোত মনে হয় একা কর্মহীন
প্রতিবেশী নেই
থাকলেও নিঃসঙ্গ সে কারণ সর্বদা।
পরধর্ম ভয়াবহ ভাটায় জোয়ার
আন্দোলন সন্ত্রাসে নিঃশেষ
তাই প্রতীক্ষায় স্তব্ধ কিন্তু সমুদ্যত
অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে খরদীপ্ত নৃত্যমঞ্চে বোল ছড়ানোর
আগের মিনিটে আভঙ্গ আতত
বালাসরস্বতী কিম্বা রুক্মিণী দেবীর মতো।—
আসন্নসম্ভবা অম্বুমুখী জননীর মতো
বৈশাখীর বৃষ্টির আগের স্তব্ধতায় সতর্ক গম্ভীর—
বলা যায় জ্যাবদ্ধ ধনুর মতো
কিম্বা যেন বন্যা ধরে তাতার সংযম একাগ্র সংহত
পামীরে আবার কিম্বা বুঝি কৃষ্ণ কাস্পিপ সাগরে
তারপর লাগে দোলা লাগে দোলা
খরশর স্রোত
কল্লোলে মুখর
সমুদ্রে সমুদ্রে ওঠে তালে তালে
সমুদ্রে নদীতে নীল মহাসমুদ্রের কান্নায় হাসিতে

সাগরউত্থিতা সেই অগ্নিহোত্রী সুন্দরীর আবিশ্ব আভাসে
ঊর্মিল জোয়ার

একাকার মুহূর্তে তখন চূড়ায়িত ক্ষণে সাম্প্রতিক
অতীত ও আগামীর গান
প্রাত্যহিকে প্রাত্যহিকে
পলিতে উর্বর দিকে দিকে মানসে শরীরে
জীবনে জীবন।

তোমার স্রোতের বুঝি শেষ নেই, জোয়ার ভাঁটায়
এদেশে ওদেশে নিত্য ঊর্মিল কল্লোলে
পাড় গ'ড়ে পাড় ভেঙে মিছিলে জাঠায়
মরীয়া বন্যার যুদ্ধে কখনও বা ফল্গু বা পল্বলে
কখনও নিভৃত মৌন বাগানের আত্মস্থ প্রসাদে
বিলাও বেগের আভা,
আমি দূরে কখনও বা কাছে পালে পালে কখনও বা চালে
তোমার স্রোতের সহযাত্রী চলি ভোলো তুমি পাছে
তাই চলি সর্বদাই,
যদি তুমি ম্লান অবসাদে
ক্লান্ত হও স্রোতস্বিনী, অকর্মণ্য দূরের নির্ঝরে
জীয়াই তোমাকে পল্লবিত ছায়া বিছাই হৃদয়ে,
তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া
তোমারই ঘাটের গাছে
ফোটাই তোমারই ফুল ঘাটে ঘাটে বাগানে বাগানে।

জল দাও আমার শিকড়ে॥

দু'জন

জীবনানন্দ দাশ

(১৯৩৯-এর পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু পরিবর্তিত)

'আমাকে খোঁজো না তুমি বহুদিন—কতদিন আমিও তোমাকে
খুঁজি নাকো ;—এক নক্ষত্রের নিচে তবু—একই আলো
পৃথিবীর পরে
আমরা দুজনে আছি ; পৃথিবীর পুরোনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
প্রেম ধীরে মুছে যায়, নক্ষত্রেরও একদিন ম'রে যেতে হয়,
হয় না কি ?'—ব'লে সে তাকালো তার সঙ্গিনীর দিকে ;
আজ এই বিকেলের মাঠ সূর্য সহধর্মী অঘ্রাণ কার্তিকে
প্রাণ তার ভ'রে গেছে।

দুজনে আজকে তারা চিরস্থায়ী পৃথিবী ও আকাশের পাশে
আবার প্রথম এলো—মনে হয়—যেন কিছু চেয়ে—কিছু
একান্ত বিশ্বাসে।
লালচে হলদে পাতা অমুষঙ্গে জাম বট অশ্বত্থের শাখার ভিতরে
অন্ধকারে ন'ড়ে-চ'ড়ে ঘাসের উপর ঝ'রে পড়ে ;
তারপর সান্ত্বনায় থাকে চিরকাল।

যেখানে আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে,
হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হ'লে ক্রমে-ক্রমে যেখানে মানুষ
আশ্বাস খুঁজেছে এসে সময়ের দায়ভাগী নক্ষত্রের কাছে :
সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দুজন ;—চারিদিকে কাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে ;—চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি ;
ঘুঘুর পালক যেন ঝ'রে গেছে—শালিকের নেই আর দেরি,

হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু ক'রে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে ;
ঝরিছে মরিছে সব এইখানে—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে।

নারী তার সঙ্গীকে 'পৃথিবীর পুরোনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
জানি আমি ;—তারপর আমাদের দুঃস্থ হৃদয়
কী নিয়ে থাকিবে বল ;—একদিন হৃদয়ে আঘাত ঢের দিয়েছে চেতনা,
তারপর ঝ'রে গেছে ; আজ তবু মনে হয় যদি ঝরিত না
হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের,—প্রেমের অপূর্ব শিশু আরক্ত বাসনা
ফুরোতো না যদি, আহা, আমাদের হৃদয়ের থেকে—'
এই ব'লে ম্রিয়মাণ আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
উদ্বেল কাশের ভিড়ে দাঁড়ায়ে রহিল হাঁটুভর।
হলুদ রঙের শাড়ি, চোরকাঁটা বিঁধে আছে, এলোমেলো অঘ্রাণের ঝড়
চারিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে ছেনে যেতেছে শরীর ;
চুলের উপরে তার কুয়াশা রেখেছে হাত, ঝরিছে শিশির ;—

প্রেমিকের মনে হ'লো 'এই নারী—অপরূপ,—খুঁজে পাবে
নক্ষত্রের তীর ;
যেখানে রবো না আমি, রবে না মাধুরী এই, রবে না হতাশা.
কুয়াশা রবে না আর,—জনিতা বাসনা নিজে—বাসনার
মত ভালোবাসা
খুঁজে নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ঈপ্সিতেরে তার।'

সাঁওতাল গান

১

নীল পাহাড়, সবুজ পুকুর, ঠাণ্ডা জল,
ময়লা কমিদনে কোয়েল পাখি,
বন্ধু আমার মনে করবে।

২

জোড়া ঘুণী ছুটে এলো উপরদেশ থেকে,
বারান্দায় তুলোর পাঁজ তৈরি—
খবরদার! ঘুণী হাওয়া উড়িয়ে নেবে।

৩

ঢোল বাজে নাগড় বাজে রাস্তায়।
আমি জলের ঘাটে ছিলাম,
সেই শুনে মজে গেলাম,
জলের ঘড়া তুলতে গিয়ে ফাটল।

৪

আমি নদীর এপারে,
তুমি নদীর ওপারে,
আমায় ভালোবাসো তো?
আমায় ভালোবাসো তো?
দাও না ভরে কদম ফুল পায় ছুঁড়ে।

৫

পথে-পথে চলেছি,
মধ্যিপথে বাদলা গাছ।
গাছে বসে স্বর্ণপুঁথি পড়লো,
পুরোনো বন্ধুকে খাসা।

৬

যতদিন বিয়ে হয়নি
সারা রাত নেচেই কাটতো,

এখন ছেলেপুলে নিয়ে
কত রাত চিন্তায় ভোর।

৭

শ্রাবণ মাসে শুকনো হোলো
ভাদ্র মাসে বর্ষা এলো
হায় রে হায় স্বর্ণ চিতা!
ধান মরল
মানুষের প্রাণ মরল।

৮

বেটা হইল বড়,
তার বৌ আসবে ঘরে।
আমার মন এত খারাপ কেন?

৯

ছোটো ছিলাম যখন বিয়ে দিলে।
বাবা আমায় দেখবে এসো একবার,
কুদনা • কত ঢিলে হ'লো।

১০

এত বড় পৃথিবী
জ্বলছে দুটি তারা।
জনম কালেও দুটি তারা হে ভগবান!
মরণ কালেও দুটি তারা হে ভগবান!

১১

কাকী কাকী কাকীমা
একটু ছায়া একটু রোদ।
থাকতো যদি আমার মা;
জোড়া পাল্কি চ'ড়ে যেতাম
চামর চৌদলও দুলতো।

• হাতের নাড়া

১২

ছোটো ছিলাম যখন বিয়ে দিলে বাবা !
আমার জনম ঘরের দিশা নাই ।
পথের ধারে জেলের ছেলে,
জেলের ছেলে বাৎলে দিলো
আমার জনম ঘরের পথ ॥

———

('হিরো' পরবের গান)

১

বৃষ্টি পড়ে ঝিপির ঝিপির
বৃষ্টি পড়ে হেথায় হোথায়
মাছ চলেছে বিরিং বিরিং ।
কাঁকী চল মাছ ধরি যাই কুথেডে,
কাকী চল মাছ ধরি যাই ঝিক্কিরে ।
মাছের ঝাঁক চললো
চললো নদী বেয়ে,
কুথেড ভাঙলো, ঝিক্কির ভাঙলো
মাছের ঝাঁক কোথায় গেলো ভেসে ।

২

কোথাও কাঠ নেই
কোথাও পাতা নেই,
ঝোপজঙ্গল সাফ
বনজঙ্গল সাফ ।
এখন তবে নুন বেচো
তামাক পাতা তাও বেচো,
শিরিলপির বাজার কত দূর ?

৩

একটা শেলেট
একটু কাগজ,
নামটি লিখে রাখো।
তোমার আঙিনায়
আমার আঙিনায়
খেজুর মাথা নাড়ে দুলছে পেঁপে গাছ।
ফল নিয়ে বেচবো তামা দিয়ে কিনবে,
পাতা তুলে বেচবো সোনা দিয়ে কিনবে।
ঝড় উঠলো পুবে রে,
ঝড় উঠলো পশ্চিমে,
আমার পেঁপে গাছ রে, তোমার গাছও প'ড়ে গেলো।

৪

হিরিঝিরি পুকুরে সিরিসিরি দিঘিতে
সিরিসিরি দিঘিতে হিরিঝিরি পুকুরে
কী সুন্দর ফুল রে, কী সুন্দর ফুল।
সেই ফুল তুলতে
সেই ফুল নিতে রে
দুই রাক্ষস ব'সে আছে
সেই ফুলে হাত রেখে রে।
তুললো তারা ফুল রে
ছিঁড়লো তারা ফুল রে,
কিন্তু ফুল ঝ'রে গেলো
রোদ্দুরে শুকিয়ে গেলো।

'হো'দের গান

(মাঘে পরবের গান)

১

বনের ভিতর অড়র গাছ
(হাওয়ায় দোলে)
লেসেকেন লেসেকেন
হাওয়া এলো পুব থেকে
হাওয়া এলো পশ্চিমের
দোলে গাছ দোলে পাতা হাওয়ায় রোলে
লেসেকেন লেসেকেন ॥

২

ইশ কী গরম, উঃ কী রোদ্দুর,
তবু আম গাছে পাতা গজায় না তো।
নতুন বৌ আসে, নতুন বৌ এলো,
তবু আম গাছে পাতা গজায় না তো।

৩

চাইবাসা থেকে পিতলের বাঁশি
কলকাতা থেকে সোনার বেহালা,
বলো তুমি রাখবে কথা রাখবে তো ?
ও, বাঁশি ভাঙবে ?
বেহালা ফেলে দেবে ?
তবে তোমার উল্টে ফেলে ঘাড় ভাঙবো।

৪

দুই বনের মাঝে রে
সিম সিরুং ফলেছে,

ঘেঁষাঘেষি কত রে
সিম সিরুং ফলেছে।
যাঃ! এ তো সিরুং না,
সিম না, সিরুং না,
মেয়ের দল দাঁড়িয়ে আছে রে।

৫

মোড়লের আঙিনায়
মোড়লের আঙিনায়
কাঁসার বাসন ঝনঝনিয়ে বাজে।
না, এ তো বাসন না,
ককথনো বাসন না,
মোড়ল তার মাইনে শুনছে ব'সে।

৬

বনের ধারে অড়র গাছ
বনের ভিতর অড়র গাছ
রোদ্দুরে নেতিয়ে পড়েছে।
না রে না রোদ্দেও না,
না রে না বনেও না,
আমার পরান অড়র গাছ
কিসের টানে নেতিয়ে পড়েছে।

৭

ও মাইলগেলের • সুন্দরী
তোমায় দেখে পরান আমার কী আনন্দে নাচে।

তুমি খিলখিলিয়ে হাসো,

• গ্রামের নাম

সে-সুর আমার কানে আসে
তোমায় আমি ছিনিয়ে নিয়ে যাবো।

উঁচু নিচু রাস্তা বেয়ে চলো
মাঝে-মাঝে ডাইনে-বাঁয়ে চেয়ে,
তোমার চলা দেখে-দেখে
পরান আমার কী আনন্দে নাচে।

কলাপাতার সবুজ তোমার গায়ে।
তোমার মনও মজেছে তো, মজেছে তো?
একটু তবে সবুর করো আমার তরে।

লঙ্কা যেমন টকটকে লাল, টুকটুকে লাল,
সিংবোংআ কী সুন্দরই না বানিয়েছেন
কী সুন্দরই বানিয়েছেন তোমায়!

বাচ্চা জন্তু চলেছে, কখনো পিছন পানে চায়,
হিংস্র জন্তু তার পিছনে যায়।

ও সুন্দরী সোনার মেয়ে,
সখির দলে তোমার খেলা
মাছের খেলা গঙ্গানদীর জলে।

রক্তরাঙা গোলাপফুল
বাতাস তার গন্ধ বয়ে আনে
তোমার মাথায় সে-ফুল দেবো গুঁজে॥

ও সুন্দরী, মাইলগেলের সোনার মেয়ে,
একটিবার আমায় কিছু বলো,
তবে তো প্রাণ নাচে আমার আনন্দে।

তুমি নাটালফুলের মতো শাদা
অলছো তুমি পূর্ণিমার চাঁদ ॥

তুমি শালুক ফুল,
তোমার হাসি বাঙালি মেয়ের মতো ॥

ও সুন্দরী, ওগো আমার সোনামতী
আমায় যদি ভালোবেসেই থাকো
তবে চলো একসঙ্গেই চলো।

ভূমিজদের গান

১

বাগানবাড়ির ভিতরে
তিতির স্নান করে বাবা!
গায়ে লাল মাটি মাখে
তিতির স্নান করে!

২

খেজুর খেজুর!
হিলে না দোলে না দাদা
খেজুর খেজুর!
গিরে পড়িল [illegible]
খেজুর খেজুর!
বানে ভাসিল
খেজুর খেজুর!

সুরজিৎ সিংহ

যাকে চাই

মণীন্দ্র রায়

যাকে চাই সে তো এক নয়, খুঁজি তাই নিশিদিন ;
মিশি মেলাহাটে, কপাটের খিলতোলা ঘরে ঘরে ;
ঢেউয়ে ঢেউয়ে তার গানে সুর বেলাবালুকায় লীন,
রেখায় চূড়ায় মিনারে মিনারে নীলমুঠি ধরে ।

পিদিমের শিসে লালের কালিমা, ছায়া কালো কালো,
ছায়া ঘোমটার টানে রাঙে মন, রঙ ঝিকিমিকি
সন্ধ্যার লালে নীল ঝিলিমিলি পাতায় মিলালো,
আনত হিজলে তেজা হাওয়া কাঁপে, খুশি ভরে দীঘি
শিহরে সবুজ ঢেউয়ে, পাড়ে পাড়ে ঘাসের শিথানে
ঘুমপাড়ানিয়া দোলা লাগে, খোলে রূপসীর চুল
হঠাৎ প্রেমের জোয়ারে, কোমরে বাহুর খিলানে
বুকে মুখে টানাচোখে ক্ষণিকের কালের পুতুল ।

যাকে চাই, শত উর্বশী পলাতকার বেশে
স্খলিত আঁচলে স্মৃতি তার সারা বাংলাদেশে ॥

প্রথম আষাঢ়

দেবদাস পাঠক

অবশেষে বৃষ্টি এলো। যখন ক্লান্ত মনের
দুকূল ছাপিয়ে কান্নার ঢেউ, থরোথরো দিন—
রাত্রির ব্যথা দুঃসহ। মেঘ পলাতক ; আর
রুক্ষ রক্তিমা দিগন্তে। দূর পলাশবনের
পাতায় হলুদ বেদনার ছাপ লাগলো। মলিন
সন্ধ্যার চোখ কাকুতি-করুণ। বৃষ্টির ছাট
তখনই লাগলো জানালায়। এলো প্রথম আষাঢ়।

শার্সি ছলোছলো, পাগোল হাওয়ার
দাপাদাপি আমার ঘরে, আর ঝরোঝরো জল
বাইরে। মনের অন্ধ গলিতে থামলো,
কান্না থামলো। নামলো অন্ধকারে
বুক জুড়ে এ কী সান্ত্বনা—যেন মমতার ঢল
হিসেবের বাঁধ ভাঙলো। ময়লা পাটিগণিতে
কাগজের নৌকো ভাসিয়ে হৃদয় সহসা ময়ূর।

একুশ

মুকুল ভট্টাচার্য

এবার গ্রীষ্ম একুশে পড়লো।
হায়রে কোথাও নেই কোরক
আমের-জামের। তাহোক, তাহোক,
আমার গ্রীষ্ম একুশে পড়লো।
যেদিকে তাকাই শুকনো পাতার
ঝরা রাশি আর
রুক্ষ ধূলো।
তাহোক, তাহোক,
আমার বৃন্তে গ্রীষ্মে কোরক :
কোন পাখি কবে ফেলে গেছে তার টুকরো খড়।
সেই খড় উড়ে আমার গ্রীষ্মে উঠলো ঝড়!
কিছু নেই আর কিছু নেই—
হায়রে একুশ পেয়েছো এই
পোড়া পৃথিবীর শুকনো ধূলোর রুক্ষ ঝড়।
ফেলে-যাওয়া যতো টুকরো খড়!
তাহোক, তাহোক,
আমার বৃন্তে একুশে অবাক এ কার কোরক?
চেয়ে-চেয়ে দেখি কৃষ্ণচূড়ার
উল্লাস আর
তোমার হাতের টুকরো খড়।
সেই খড় উড়ে আমার গ্রীষ্মে উঠলো ঝড়।
হাওয়ায় টান,
রৌদ্র জ্বালায় প্রখর গান।
কবে ফেলে গেছো তোমার হাতের টুকরো খড়,
গ্রীষ্ম আমার একুশে এবার উঠলো ঝড়।

অখ্যাত

দেবব্রত সেনগুপ্ত

আলোর বিশ্বাস নিয়ে
একবিন্দু সত্য কাঁপে
আকাশের অন্ধকারে জেলের নৌকায় ;
ভেসে যায়—
দিনের বিশ্বাস নিয়ে রাত্রির আঁধারে
দূরে চ'লে যায়।
মাঝে-মাঝে কেঁপে-কেঁপে কাছে ভেসে আসে
মুহূর্তের অবকাশে চোখে দেখা যায়।
আবছায়া লাল আলো জেলেদের গায়।
মাঝ-দরিয়ায় দোলে
খ্যাতির আলোকে ভোলে
জাহাজের বিশাল ভূগোল।
আলো ভাঙে ছায়া হ'য়ে, চিকমিক জল
ছলছল
জোয়ারের উদ্দাম ঢেউ
জাহাজের পায়ে বৃথা মাথা কুটে মরে,
খ্যাতির আলোকে জ্বলে সফরী জাহাজ,
অবুঝ জোয়ারে এ কী বিনীত উচ্ছ্বাস।
সেই ফাঁকে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে নাচে
দুঃসাহসিক জেলে ডিঙি
সত্যের শপথ নিয়ে,
বিন্দু-বিন্দু আলো নাচে দুলে-দুলে
ব্যঙ্গ করে নদীর জোয়ারে।

তবু আশা বেয়ে চলে ওরা খ্যাতিহীন—
ছাড়ায় নদীর সীমা।
মুছে যায় অবিরল জলে
এ-তুচ্ছ প্রভেদ,
দূরের পারের ঘরে মাটির প্রদীপ জ্বলে
প্রাণের সংকেত।

চিঠি

জয়ন্তী সিংহ

উতলা বাতাস এলোমেলো,
হে প্রিয়তম,
আজ সন্ধ্যায় লিখবো কি চিঠি
গভীরতম !
স্বর্ণচাঁপার গন্ধে মাতাল স্মৃতি
(মনের পাথরে চাপা-পড়া যত কঙ্কাল)
এলোমেলো হাসে কী যে কথা কয় চাঁদের আলোয়
পৃথিবী আজকে কাঁপছে দেখি
তারও কি লাগলো নেশা !
রাতের পাখির অঝোর প্রলাপ ঝরছে দূরে
তারও বুঝি এই পেশা।
আমিও হঠাৎ খাপছাড়া চিঠি
(মূল অর্থটি তুমি বুঝে নিয়ো, প্রিয়)
লিখতে বসেছি পতন ঘটছে ছন্দে
সব কথা আজ ঝিমঝিম করে
স্বর্ণচাঁপার গন্ধে।
আজ সন্ধ্যায় ঝাপসা স্মৃতির
জের টেনে নিয়ে লিখবো কি ফের সুনিপুণ কৌশলে।
একদিন রাতে লেকে
(হয়তো বছর দশেক আগে)
আবোলতাবোল কত কী যে বলেছিলে
রাকার আলোয় চোখে চোখ রেখেছিলে
সময় কেটেছে প্রলাপ ব'কে

ভবিষ্যতের নক্সা এঁকে
সেই রাত্রির সেকে !
পূর্ণ চাঁদের মদির আলোয়
ঘাসের শিশিরে শাদায় কালোয়
মনের তুলির বিচিত্র টানে
আলপনা এঁকেছিলে—
সেই কথা ভেবে লিখবো কি চিঠি
বলো তো প্রিয়,
পাঠাবো এ-চিঠি যার কাছে, তার
মন কি সেখানে ব'সে আছে আর—
মূল অর্থটি না যদি বোঝো তো
ফেরৎ দিয়ো।

তোমার চোখ

অরবিন্দ গুহ

হাওয়ায়-হাওয়ায় কতো গান আমি গেয়েছি হেঁকে।
আষাঢ়ের জল জানালার 'পরে ঝরেছে বেঁকে,—
আঁকাবাঁকা জল মনের এ-কথা অন্ধকারে,

মেঘ জ'মে ওঠে আকাশে ও ঘাসে, মাঠের পারে।
হাজার চোখের কথা শুনায়েছে পথের লোকে :
তোমার চোখের মতো দুটি চোখ পড়েনি চোখে।

মালতীলতায় দুপুর ঘুমায় হাওয়ার সুরে ;
হাতে হাত ধ'রে গোল হ'য়ে যারা নেচেছে ঘুরে
ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে অনেক দূরের ছায়ার গানে ;

কাজল চোখের সে-ছায়া যে কার কেউ কী জানে।
হাজার চোখের গল্প বলেছে হাজার লোকে :
তোমার চোখের মতো কালো চোখ দেখিনি চোখে।

রঙিন ঝিনুক সমুদ্দুরের কিনারে আঁকা,
ঢেউয়ের ফোঁটায় শামুকের রং আধেক ঢাকা।
স্বপ্নে তোমার কান্নায় ঘুম ভেঙেছে কতো :

তোমার কান্না আমার ঝিনুকে ঢেউয়ের মতো
হাজার চোখের কথা ব'লে গেছে হাজার লোকে :
তোমার চোখের মতো দুটি চোখ পড়েনি চোখে।

টবের গাছ

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই সিঁড়ি দিয়ে আমি কতবার উঠেছি নেমেছি ।
তোমার ঘোরালো সিঁড়ি স্তব্ধতায় ভরা,
আমার যত না আনাগোনা
কোনোদিন প্রতিধ্বনি তোলেনি সেখানে ।
সিঁড়ির শেষের ধাপে টবের মাটিতে
কী এক সৌখীন চারাগাছ
এ-উদাস নিয়মের সাক্ষী হ'য়ে আছে ।

এই গাছ এতদিন দেখেও দেখিনি ।
তোমার মনের ছাই ব'য়ে নিয়ে চ'লে যেতে-যেতে
এ-গাছের সামনে সেদিন
অন্য মনে ফিরে তাকালাম ।
অপুষ্পক গাছ
বোবা পত্রপুঞ্জে তার কোনোদিন শিশির ঝরে না,
অরণ্যমর্মর থেকে নির্বাসিত এই এক দরিদ্র জীবন ।
এই গাছ ছায়া দিতে জানবে না,
অপ্রতিভ ফেরৎ পাঠাবে
দক্ষিণে হাওয়ায় ।
জানাবে না নিমন্ত্রণ,
কিংবা অভ্যর্থনা,
মৌমাছিরা ফিরে যাবে,
ব্যর্থ হবে ঋতুর বাহার ।
কত ব্যর্থ তার আয়ু

কোনোদিন বুঝবে না নিজে।
আমিও বুঝি না
তোমার সিঁড়িতে এই চারাগাছ কেন যে রেখেছো,—
বুঝেও বুঝি না এতদিনে।

ব্যর্থতা

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশের বহু স্বপ্ন
পৃথিবীর অনুর্বর মাঠে
বুনে বুনে ব্যর্থ হলে পর
নামে পাখিদের
ঘুমোবার রাত।
ধূসর ছায়ায় বোজে
নীড়ের কপাট।

সে-ব্যর্থতা ভেসে আসে
আমাদের ঘরে,
নামে অন্ধকার।
চেতনার অতন্দ্র গভীরে
স্বপ্নের অঙ্কুর তোলে
ক্ষীণ আর্তনাদ।
চুপ ক'রে ব'সে থাকি,
ঘিরে আসে গভীর বিষাদ।
তবু দূরে আলোর আকাশ,
তবু দূরে উজ্জ্বল আকাশ,
পাখিদের সাথে এই
আমাদের একটু তফাৎ।

তিনটি কবিতা

ষটকৃষ্ণ দে

কথা

ছোটো-ছোটো কথা। টুকরো ঢেউয়ের মতো
হালকা দেখতে।
তবু কতো ভারি।
কথা যে হৃদয় তাই
এতো তার দাম,
তাই তাকে নিয়ে আজো অস্থির চলছে নিলাম!

নাম

এই নদী, এই ঢেউ কতোবার ছুঁয়েছে তোমায়!
স্বেচ্ছায় দিয়েছ ছেড়ে তোমার তুমি-কে তার হাতে।
বালির শরীরে আঁকা লোনা কতো নাম,
তার দাম
দিয়েছ অনেক বার তুমি।
আমি শুধু তার নীচে আরো দু'টি বর্ণ বসালাম।

স্পর্শ

বেতের লতার মতো থরোথরো স্রোতে-কাঁপা মন
সকালে ফুলের মতো ছুঁয়েছি যখন,
তখনই হাওয়ার সুরে পাপড়িতে পাতায়
হৃদয় শিশির হ'য়ে আলগোছে যায় ঝ'রে যায়।

শান্তিনিকেতনে ছুটি

নরেশ গুহ

দূরে এসে ভেবে থাকি : সে হয়তো এসে বসে আছে।
হয়তো পায়নি ডেকে, একা ঘরে জানালার কাচে
বৃষ্টির বর্ণনা শুনে ভুলে গেছে এটা কোন সাল,
ভুলে গেছে জীবনের দরিদ্র ধীবর আর জাল
জোড়া দিতে পারবে না। যদি দেয় তবু ক্ষীণ হাতে
সেই ধূর্ত মাছটাকে পারবে না ডাঙায় ওঠাতে।
পারলেও অভিজ্ঞান সে-অঙ্গুরী হয়তো বা ফিরে
পাবে না পাবে না তার শীতল পিচ্ছিল পেট চিরে।
যদি পায় ?
যদি তার এতকাল পরে মনে হয়—
—দেরি হোক, যায়নি সময় ?

শান্তিনিকেতনে বৃষ্টি : ছুটি শেষ। ভিজে আলতা-লাল
শূন্য পথ। ডাকঘরে বিমুখ কাউন্টর চুপ। কাল
হয়তো রোদ্দুর হবে, শুকোবে খোয়াই, ভিজে ঘাস।
লোহার গরাদ ঘেরা আম্রকুঞ্জে কবিতার ক্লাস
কাল থেকে ফের। ঘুমে ফোলা চোখ, ভাঙা ভাঙা গলা
কবে সে মন্থর পায়ে পাতাঝরা ছাতিম তলায়
একা এসে ঘুরে গেছে ?
ঘণ্টা শুনে হঠাৎ কখন
অকারণে দিন গেল : ছায়াচ্ছন্ন শান্তিনিকেতন।

কলকাতায় ফিরে যদি—যদি আজ বিকেলের ডাকে
তার কোনো চিঠি পাই ? যদি সে নিজেই এসে থাকে ?

আজকের দিনে বীরবল

অরুণকুমার সরকার

মেজাজটা মজলিসী হলেও, প্রমথ চৌধুরীর স্বভাবটা ছিল যুক্তিবাদী তার্কিকের। সামনে একজন প্রতিবাদী খাড়া না-থাকলে, লেখায় তিনি তেমন জুত পেতেন না! শুধু-যে তাঁর প্রবন্ধের বেলাতেই একথা খাটে, তা নয়। তাঁর রচিত ছোটোগল্পগুলিও মূলত কথোপকথন-নির্ভর, তর্কবিতর্কের ঠাসবুনুনিতে সময়-সময় আধা-প্রাবন্ধিক।

আত্যন্তিক যুক্তিনিষ্ঠা আবেগের স্বতঃস্ফূর্তিকে প্রতিহত করে। সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তিই-যে প্রমথ চৌধুরীর মনোজগতে সর্বেসর্বা হবে, তা তো জানা কথা। কিন্তু এর ফলেই কিনা জানি না, সংলাপসৃষ্টিতে অসামান্য কুশলী হ'য়েও তিনি নাটকরচনায় প্রবৃত্ত হননি; কাব্যকলার ক্ষেত্রে তাঁকে আঁটোসাঁটো চতুর্দশপদীর আশ্রয় নিতে হয়েছিল; আর, সত্যি কথা বলতে, নির্ভুল ব্যাকরণ এবং বিস্ময়কর চাতুর্য সত্ত্বেও, হার্দ্য কবিতা একটি-দুটির বেশি তিনি লিখে উঠতে পারেননি; এবং, সম্ভবত গল্পেও নয়, আত্মপ্রকাশের অবলম্বন হিসেবে প্রবন্ধেই তিনি অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছিলেন।

'অপেক্ষাকৃত',—কেননা, প্রাণ যা চায়, আমার মনে হয়, প্রমথ চৌধুরী তা কদাচিৎ লিখে ওঠবার ফুরসত পেয়েছেন। বস্তুত, নিজের জালেই তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর প্রাথমিক সংকল্প ছিল পারতপক্ষে সংস্কৃত শব্দের দ্বারস্থ না-হয়ে, কথ্য ভাষা আর সংলাপী ভঙ্গিমায় সর্বজনবোধ্য সাহিত্য রচনা করা। কিন্তু কলমে হাত দিয়েই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সাধারণ বাঙালী যে-ভাষায় বাক্যালাপ করে তা হুতুম পেঁচার খিস্তিখেউড় মাত্র: সে-ভাষায় হাটবাজার চলে,

বীরবলের হালখাতা: প্রমথ চৌধুরী; বিশ্বভারতী। তিন টাকা

চিন্তা করা যায় না এবং ইতিপূর্বে কেউ ক'রেও যায়নি, কেননা মনন-ক্রিয়ার ব্যাপারটা প্রাক্-ইংরেজ আমলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরই একচেটে ছিল, এবং সংস্কৃতই ছিল তাঁদের তত্ত্বালোচনার অবলম্বন। সুতরাং সংকল্পসিদ্ধির প্রয়োজনে প্রমথ চৌধুরীকে সম্পূর্ণ নূতন একটা রাস্তা তৈরি ক'রে নিতে হয়েছিল ; এবং সেই নির্মাণকার্যের গুরুতর পরিশ্রমে তাঁর সাহিত্যিক স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি হয়েছিল সন্দেহ নেই। কেননা, তাঁর গদ্য-যে বহু চেষ্টায় তৈরি-করা অভিনব বস্তু,—অত্যধিক অহংচেতনায় কখনো অতি-সপ্রতিভ, কখনো বা নববধূর মতো আড়ষ্ট,—এই অস্বস্তি-কর সত্যকে গোপন করার জন্য প্রায়ই তাঁকে গলদঘর্ম হতে হয়েছে। তাই বীরবলী গদ্যে, সাহস ক'রে ঝ'রেই ফেলি, স্রোত নেই। মনে হয় ভারি বুটজুতো প'রে একদল সৈনিক কুচকাওয়াজ করছে, তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ মাপাজোখা, একঘেয়ে এবং নিষ্ঠুর। রবীন্দ্রনাথ এবং বীরবলের রচনা একসঙ্গে পড়লে আমার বক্তব্যটা, আশা করি, স্পষ্টতর হবে

'সাহিত্য শিক্ষার ভার নেয় না, কেননা মনোজগতে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কবির কাজের ঠিক উলটো। কবির কাজ হচ্ছে কাব্য সৃষ্টি করা, আর শিক্ষকের কাজ হচ্ছে প্রথমে তা বধ করা, তার পরে তার শবচ্ছেদ করা—এবং ঐ উপায়ে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করা ও প্রচার করা। এইসব কারণে নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, কারও মনোরঞ্জন করাও সাহিত্যের কাজ নয়, কাউকে শিক্ষা দেওয়াও নয়। সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়।' (বীরবলের হালখাতা—১২৭ পৃঃ)

'হচ্ছে' এবং 'করা'—এই দুটি ক্রিয়াপদের পৌনঃপুনিক ব্যবহার আজকাল আমাদের কানে সহ্য হওয়া সহজ নয়। অথচ ক্রিয়াপদের পুনরাবৃত্তিতে সর্বদাই-যে বাক্যের কাঠামো হতশ্রী হয়, এমন নয়। উদাহরণ হিসেবে প্রমথ চৌধুরীর 'রায়তের কথা' নামক পুস্তকের জন্য

রবীন্দ্রনাথ যে-ভূমিকা লিখেছিলেন, তা থেকে একটি অংশ উদ্ধার করছি :

'আর দেশে যখন এই প্রগল্‌ভ বাগ্‌বাষ্প বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্ব-স্তরে বিচিত্র বাষ্পলীলা রচনায় নিযুক্ত, তখন দেশের যারা মাটির মানুষ, তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্চে, মরচে, চাষ করচে, কাপড় বুনচে, নিজের রক্তে মাংসে সর্বপ্রকার শ্বাপদ-মানুষের আহার জোগাচ্চে, যে দেবতা তাদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হন, মন্দির প্রাঙ্গণের বাইরে সেই দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করচে, মাতৃভাষায় কাঁদচে, হাসচে, আর মাথার উপর অপমানের মুষলধারা নিয়ে কপালে করাঘাত ক'রে বলচে, "অদৃষ্ট !" '

বাংলা শব্দের উচ্চারণে উচ্চাবচতা বা এ্যাক্‌সেণ্ট না থাকায় তা একান্তভাবেই বানানের গাঁটছড়ায় বাঁধা। এদিকে প্রাকৃত বাংলা শব্দকে তদ্ধিতপ্রত্যয়ের অধীনে আনা এক প্রকার অসম্ভব বললেই চলে। এই অবস্থায় বাক্যের ছন্দলীলাকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন প্রধানত ধ্বনিমুখর সংস্কৃত যুগ্মশব্দের আশ্রয় নিয়েছিলেন, প্রমথ চৌধুরী তেমনি জোর দিয়েছিলেন প্রাকৃত বাংলার হসন্তবহুল ক্রিয়াপদের উপর। রবীন্দ্রনাথের গদ্য এই দুই রীতির আশ্চর্য সমন্বয়।

কিন্তু মনে রাখা দরকার বীরবলের অধিকাংশ রচনা আজ থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে, ১৯১০ থেকে ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত। ইতিপূর্বে কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের পরীক্ষা নিরীক্ষায় বিদ্যাসাগরী গদ্যের বহিরঙ্গে বেশ কিছু রদবদল ঘটে গেলেও, সেই সময়কার সাধুভাষা প্রকৃতপক্ষে বর্ণচোরা ইংরিজি বাক্যের তর্জমা বই আর কিছুই ছিল না। বাংলা গদ্য-যে বিধর্মী ইংরেজ পাদ্রীদের সৃষ্টি, আষ্টেপৃষ্ঠে সংস্কৃত শব্দের নামাবলী জড়িয়ে এবং সংস্কৃত বৈয়াকরণকে ভক্তভাউসে বসিয়ে সেই কেচ্ছা ঢেকে রাখবার চেষ্টা চলছিল। আর মজা এই যে, বিকল্পের অভাবে, এই দোআঁশলা বাক্যগঠন-

রীতিতেই সাধারণ বাঙালী পাঠকের কান অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিল। প্রমথ চৌধুরীই সর্বপ্রথম বাংলার খাঁটি বাক্‌বিন্যাসরীতিকে তন্নিষ্ঠভাবে, আলালী গ্রাম্যতা পরিহার ক'রে, সাহিত্যিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। যদিও সেই বাক্‌বিন্যাসরীতির প্রচলন ছিল শহরের শিক্ষিত কয়েকজনের মধ্যেই, তবুও তার গড়নে বাঙালিয়ানার ছাপ অধিকতর সুস্পষ্ট বৈকি। বলা বাহুল্য, ক্রিয়াপদ এবং সর্বনামের পোষাক বদলেই প্রমথ চৌধুরী ক্ষান্ত হননি; সে-কাজ তো রামা-শ্যামাই করতে পারত। সরাসরি মৌখিক রীতির অনুসরণে বাক্যগঠন ক'রে, গদ্যে প্রবন্ধে বাংলার প্রচলিত বোলবুকনি, প্রবাদপ্রবচনকে মার্জিতভাবে প্রয়োগ করার কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। তাছাড়া, বাংলার সুদূর কাব্য-কাহিনীর ঐতিহ্যে স্নান করলে নবজাত বাংলা গদ্যের জড়তা যে পুষ্পিত হয়ে উঠবে, প্রমথ চৌধুরীই তা সর্বপ্রথমে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। তার ফলেই তো উপনিষদের দিক থেকে আমাদের ঘাড় ফিরল ঈশ্বর গুপ্তের গ্রাম্যতার দিকে নয়, আলালী অসভ্যতার দিকেও নয়, ভারতচন্দ্রের বৈদগ্ধ্যের দিকে এবং শিক্ষিত গদ্য তার যথার্থ কুলপঞ্জীর সন্ধান পেল।

আমার অনেক সময় মনে হয়েছে ভাষাসংস্কারকার্যই যদি প্রমথ চৌধুরীর অদ্বিতীয় লক্ষ্য হ'ত, তাহলে তিনি তাঁর গদ্যকে নিয়ে অনায়াসেই ভেল্‌কি খেলাতে পারতেন যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে। কিন্তু বীরবল, আগেই বলেছি, মস্তিষ্কপ্রধান ব্যক্তি ছিলেন; লেখার আনন্দে আগড়ুম বাগড়ুম লিখে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না; সুষ্ঠু, সুবিন্যস্ত চিন্তাধারাকে রূপ দেবার তাগিদেই তিনি কলম ধরেছিলেন। দুর্ভাগ্যত, অশেষ অধ্যবসায় সত্ত্বেও, উদ্দেশ্য এবং উপায়ের মধ্যে সেতুরচনা করতে তিনি সমর্থ হননি। যে-কোনো প্রকারে রচনাকে সর্বজনবোধ্য করতেই হবে, এমন একটা ধারণা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। ফলে, সবল হতে গিয়ে প্রায়ই তিনি তরল হয়ে পড়েছিলেন, মাঝে-মাঝে একেবারে জলবৎতরল, এবং এইজন্য

মানসিক খুঁতখুঁতুনিতে আজীবন তিনি অশান্তি ভোগ ক'রে গেছেন। 'চু'-ইয়ারকি' নামক প্রবন্ধগ্রন্থের ভূমিকায় তাঁর আক্ষেপ খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'এ প্রবন্ধ ক'টি যতদূর পারি সহজ ক'রে লেখবার অভিপ্রায় আমার ছিল, কিন্তু ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কোন সম্প্রদায়ের নিকট এই প্রবন্ধগুলি সহজবোধ্য হবে না। আমার লেখা যে সহজবোধ্য হয়নি, তার জন্য যতটা দোষী আমি, তার চাইতে বেশি দোষী আলোচ্য বিষয়।' বস্তুত, এই ভণিতার প্রয়োজন ছিল না। কেননা আপ্রাণ সরলীকরণের চেষ্টায় শেষ পর্য্যন্ত 'চু-ইয়ারকি'র অবস্থা দাঁড়িয়েছে না ঘরকা, না ঘাটকা। বিষয়বস্তুর চরিত্র অনুযায়ী লেখার গড়নও-যে বদলানো দরকার, প্রমথ চৌধুরী তা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু আমার মনে হয়, যথাযথ অবস্থায় বীরবলী ভঙ্গিতে তন্নিষ্ঠ আলোচনা সম্ভব নয় বলেই, প্রমথ চৌধুরীর মতো মনীষীকে মুখ্যত টীকাটিপ্পনীর প্রায়-সাংবাদিক জগতে আজীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে; বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে ক্ষুরধার, শ্লেষ-কটাক্ষে তির্যক ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত টুকরো-টুকরো কয়েকটি কথা ছাড়া আর কিছুই তিনি দিয়ে যেতে পারেন নি; আর সেই সব কথা তুখোড় আড্ডায় কফির টেবিলে বসে পেয়ালা-পিরিচে অবলীলায় সঙ্গে ঢেলে দেওয়া গেলেও, লঘুকরণেই তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিসমাপ্তি ঘটে। তাই দুর্ভাগ্যক্রমে একজন জাত-সাহিত্যিক শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় ভাষাসংস্কারক হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে রইলেন।

'জাত-সাহিত্যিক',—কেননা, বস্তুত বীরবল ছিলেন লেখকদের লেখক। তাঁর গদ্য যাঁদের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে, তাঁদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং শিবরাম চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম জনের হাতে বীরবলী গদ্য নিঃসন্দেহেই পরমোৎকর্ষ লাভ করেছে; দ্বিতীয় জন, রবীন্দ্রনাথ এবং বীরবলের মধ্যে সেতুরচনা

ক'রে নিজের অসামান্য শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন ; তৃতীয় এবং চতুর্থ জন, আমার বিবেচনায়, বীরবলের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে নিজেদের মুদ্রাদোষ হিসেবেই কেবল আয়ত্ত করতে পেরেছেন। আর বীরবলের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত না হয়েও, তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নূতন প্রকরণের সন্ধান করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং বুদ্ধদেব বসু। এঁরা দু'জনেই বুঝতে পেরেছেন গদ্যও কবিতার মতো কান দিয়ে শোনবার, একটি শব্দের কম-বেশিতে বাক্যের তাল কেটে যায় এবং তার ছন্দ এবং বাঁধুনির জন্য সময়বিশেষে ইংরেজি বাক্‌বিন্যাস-রীতির আশ্রয় নেওয়াই লাভজনক। গদ্যের আদর্শ যে তৈলচিত্র নয়, ভাস্কর্য—এঁরা তা অনুধাবন করতে পেরেছেন বলেই একাধারে বীরবলী রেখাশিল্প ও রাবীন্দ্রিক রূপক-উপমা-অলংকারকে নির্মমভাবে পরিহার করতে এঁদের কষ্ট হয়নি। আমার মনে হয় তন্নিষ্ঠ আলোচনার উপযোগী 'সাহিত্যিক' গদ্যের আদর্শ এঁদের হাতেই সুঠাম স্বাস্থ্যোজ্জ্বল একটা অবয়ব পেয়েছে। হরিজন আন্দোলনে যোগ দিলে যে তাঁর জাতও যাবে, পেটও ভরবে না, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এ-কথাটা ভালো করেই বুঝতে পেরেছেন। তাই স্বল্পসংখ্যক পাঠক নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট। পক্ষান্তরে, বুদ্ধদেব বসু বিষয়বস্তুর চরিত্র অনুযায়ী লেখার ঢঙ বদলাতে কখনোই ইতস্তত করেননি। বৈচিত্র্যময় তাঁর আঙ্গিক : হালকা রচনায় একরকম, তন্নিষ্ঠ প্রবন্ধে অন্য প্রকার, ছোটোগল্পে আবার ভিন্নতর। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, বাংলাদেশের আর কোনো লেখকই বুদ্ধদেব বসুর মতো এতো বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে এমন আশ্চর্য আর সার্থক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন নি। সম্প্রতি 'তিথিডোর' নামক উপন্যাসে তিনি যে-গদ্য ব্যবহার করেছেন তা শুধু অভিনবই নয়, ঐতিহাসিক। অন্য এক দিক থেকে প্রথম চৌধুরীর সঙ্গে বিশেষভাবে তুলনীয় অবনীন্দ্রনাথ, যদিও তাঁর গদ্য সম্পূর্ণ অন্য জাতের, ভিন্ন স্বাদের। বীরবলী ভাষা যদি হয় ড্রয়িংরুমের, অবনীন্দ্রনাথের ভাষা তাহলে বৈঠকখানার। একদিকে যদি থাকে

কাউচ, অন্যদিকে ফরাস ; একদিকে ডিক্যাণ্টার, অন্যদিকে আলবোলা। প্রমথ চৌধুরীর ভাষা যেমন আধা-তন্নিষ্ঠ ব্যক্তিগত রচনার উপযোগী, অবনীন্দ্রনাথের ভাষা তেমনি রূপকথা সৃষ্টির একমেবাদ্বিতীয় মাধ্যম। বীরবলের কবিতাও-যে অনুপ্রাণিত ভক্তের সন্ধান পেয়েছিল, বিষ্ণু দে'র তেরঙ্গা রিমা এবং ত্রিওলেটী ঢঙের কবিতাগুলিই তার প্রমাণ। যে-চোদ্দমাত্রার কবিতায় বাংলা দেশে বিষ্ণু দে'র কোনো জুড়ি নেই, প্রমথ চৌধুরীর সনেটগুলিতেই তার সম্ভাবনা উপ্ত ছিল।

গদ্যের প্রাথমিক লক্ষ্য যেহেতু আপাতউদ্দেশ্যসাধন, তাই দিনে-দিনে তার ভোল বদলায়। কিন্তু বীরবল যা করেছিলেন তাকে ভোল বদলানো বলা যায় না, তাকে বলা যেতে পারে গোল-নলচে পাল্টে দেওয়া। হাজারো অসুবিধাকে অস্বীকার ক'রে একাধারে ব্যবহারযোগ্য এবং শিল্পগুণ গদ্য লেখার বিস্ময়কর নৈপ্রবিক প্রয়াস হিসেবে তাঁর রচনা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আসল কথা হল এই যে তাঁর সংক্রামক দুঃসাহস রবীন্দ্রনাথ এবং পরবর্তী প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য গদ্যলেখকের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তাঁর ঋজু চরিত্রে দোলাচলবৃত্তির স্থান ছিল না ; তৎকালীন আরো অনেক স্মরণীয় ব্যক্তির মতো দু'নৌকোয় পা দিয়ে আজীবন তিনি বিশুদ্ধ ভণ্ডামির পরিচর্যা ক'রে যান নি। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অন্তঃসারকে আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন ব'লে ফিরিঙ্গিয়ানার প্রতি তাঁর আন্তরিক ঘৃণা ছিল। এদিকে স্বদেশের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম মমত্ববোধকে তিনি কখনো জোলো স্বাদেশিকতায় রূপান্তরিত হতে দেননি। কোদালকে কোদাল বলবার সৎসাহস ছিল ব'লেই একটা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তাঁর সমগ্র রচনায় পরিব্যাপ্ত। তাই বীরবলের হালখাতায় শুধু-যে একজন শব্দক্রীড়ের সাক্ষাৎ পাই তা নয়, একজন সর্বসংস্কারমুক্ত আধুনিক মনের অধিকারীকেও আবিষ্কার করি।

সমালোচনা

ইন্দ্রধনু
উর্বশী
রূপমঞ্জরী
} কানাই সামন্ত। জিজ্ঞাসা, কলকাতা। ৩৲, ৩৲, ২৲

নতুন কবির সংখ্যা বাংলাদেশে হয়তো বেড়েছে, কিন্তু নতুন কবিতার বই সে-রকম বাড়েনি। কাজেই আধুনিক কবিতা পড়তে হলে দু'তিনটি সাহিত্য-পত্র আর নয়তো বহুপাঠে ম্লানমলাট কিছু পুরোনো বইয়ের শরণ নিতে হয়। ছিঁড়ে গেলে, কি আরো সৌভাগ্যবশত আস্ত কোনো বই হারিয়ে গেলে প্রায় ক্ষেত্রেই আর-একখানা প্রথম সংস্করণই আনিয়ে নেওয়া চলে। কেননা কবিতা যাঁরা এখনো লেখেন আর যাঁরা পড়েন তাঁদের মধ্যে কাদের দল ভারী সেটা ঠিক বলা যায় না। এ-অবস্থায় নতুন বই ছাপাতে পারেন একমাত্র তিনিই, যিনি দুঃসাহসী তো বটেই উপরন্তু ভাগ্যবান। ফলে প্রতিবেশী কবিদের এতে মনোকষ্ট বাড়ে, পরস্পরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে তাঁরা দীর্ঘশ্বাস চাপেন। এই রকম ঈর্ষাসঞ্চারী ভাগ্যবান কবি হচ্ছেন কানাই সামন্ত। একখানা নয়, দু'খানা নয়, একসঙ্গে তিন-তিনখানা বই প্রকাশ করে তিনি আমাদের তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। ১৩৩২ সাল থেকে পঁচিশ বছর ধরে যে-সব কবিতা তিনি লিখেছেন তা থেকে নিয়ে এই বই তিনখানি গ্রথিত। তিনখানিই কাগজে ছাপায় প্রচ্ছদপটে লোভনীয়।

তাঁর কবিতার প্রধান বিষয় প্রকৃতি। জীবনের, বিশেষত সমসাময়িক জীবনের বিচিত্র জটিলতা নিয়ে তাঁর কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। একমাত্র বিশ্ব-প্রকৃতির লীলাই তাঁর কবি মনে সাড়া জাগাতে পারে। কবি হিসেবে সেটাই তাঁর বিশেষত্ব। এত ফুল, এত পাখি, আর এত গাছপালার নাম সম্প্রতি আর কারো কবিতায় পড়েছি ব'লে মনে পড়ে না। চোখ ভ'রে, মন ভ'রে প্রকৃতিকে এরকম একনিষ্ঠভাবে তিনি ভালোবাসতে শিখেছেন রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে থেকে। আর সেই সব কবিতায় বৈরাগ্যের একটি অনতিব্যক্ত বিষণ্ণ সুরের ধারা প্রচ্ছন্ন।

বলার এমন কথা পৃথিবীতে অল্পই আছে যা আর কেউ আর কখনো, কোনো-না-কোনো উপলক্ষে না বলেছেন। তাতে কী এসে যায়! বিষয়ের

মধ্যে তো কবিতা নেই। কবিতা আছে সুরে, ভাষায়, রচনার বৈশিষ্ট্যে। একই বিষয়ে একশো কবিতা পড়ার পর সেই বিষয়েই নতুন আর-একটি কবিতা প'ড়ে আমরা তাই মুগ্ধ হ'তে পারি। এখানেই আসে ভাষার কথা, ছন্দের কথা, উপমা-ব্যঞ্জনার কথা। কানাই সামন্ত এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে উদাসীন।

কবিতা করতে তাঁর যে সংকোচ নেই কবির পক্ষে এটা নিশ্চয়ই প্রশংসার কথা। কিন্তু তাই ব'লে—তড়াগ, বরিষ, শিহরি, রনিছে, ঝলকে (ঝলকায় অর্থে), হেরি, উছাসি প্রভৃতি অচল শব্দ তিনি কেমন ক'রে অসংকোচে বসান ভেবে পাই না। এই ত্রুটি যেখানে নেই সেখানেই তাঁর রচনা উপভোগ্য। যেমন :

ভিজে ডুটি ডানা নেড়ে নীলকণ্ঠ পাখি
চকিতে মিলালো আম্রবনের ছায়াতে
বাদলের প্রাতে।

অনেকটা চীনে বা জাপানি কবিতার ধরন। 'ইন্দ্রধনু'র অনেক রচনা মনে হয় যেন গানের জন্য লেখা। 'উর্বশী'তে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, অবনীন্দ্রনাথের জীবনের সাধনা নিয়ে কিছু দীর্ঘ কবিতা আছে। কিন্তু 'রূপমঞ্জরী'র সমস্ত কবিতাই ছোটো মাপের। এই চালের কবিতা বাংলায় কম। 'স্ফুলিঙ্গ' বাদ দিলে, দু-চার লাইনে আঁটোসাটো সম্পূর্ণ কবিতা কিছু পাওয়া যাবে হেমচন্দ্র বাগচীর রচনায়। আলোচ্য কবিরও এ-দিকে হাত আছে মনে হয়। তিনি 'রূপমঞ্জরী'তে চীনে ও জাপানি কিছু অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে ২৩ আর ২৪ সংখ্যক কবিতার ভিন্ন অনুবাদ আছে অজিত দত্তের 'ফুল্লমের মাসে'র নতুন সংস্করণে। পশ্চিমী কবিতার প্রভাব বাঙালী কবিদের মধ্যে প্রবল। কেউ-কেউ পূর্বপন্থী হলে বৈচিত্র্য বাড়ে।

নরেশ গুহ

কবিতা

পঞ্চদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা আষাঢ় ১৩৫৭ ক্রমিক সংখ্যা ৬৬

মাটি

অমিয় চক্রবর্তী

ধান করো, ধান হবে, ধূলোর সংসারে এই মাটি
তাতে যে যেমন ইচ্ছে খাটি।
ব'সে যদি থাকো তবু আগাছায় ধরে বিন্দু ফুল
হলদে-নীল তারি মধ্যে, রুক্ষ মাটি তবু নয় ভুল—
ভুল থেকে স'রে স'রে অন্য কোনো নিয়মের চলা,
কিছু না-কিছুর খেলা, থেমে নেই হওয়ার শৃঙ্খলা,
সৃষ্টি মাটি এই মতো।

তাইতে আরোই বেশি ভাবি
ফলাবো না কেন তবে আশ্চর্যের জীবনীর দাবি।
কচি বৃন্তে গুচ্ছ অন্নধান
সোনামাঠে ছেয়ে দেবে শ্রমের সম্মান।
তারি জন্য সূর্য তাপী, বাহুর শক্তির অধিকার,
মানুষের জন্ম নিয়ে প্রাণের সংকল্প বাঁচাবার।
বৃষ্টি ঝরে, চৈতন্যের বোধে
আবার আকাশ ভরে রোদে।
তারি জন্য শিশু আঙিনায়
দৌড়ে খেলে, হাট বসে, গৌরীপুরে জমে ব্যবসায়।

অথবা মুহূর্তে সিক্ত আবেগকম্পিত বুকে
আসে কি আমার প্রিয়া, হেসে চ'লে যায়,
ক্ষণিকের নির্মম কৌতুকে ?

তবে এ-আনন কার—চেনা-চেনা দুটি চোখ ?
কত রাত্রিদিন পরে পাখি ফিরে এল ঘরে ?
অস্ফুট আলোয় দেখি চেনা এ-পালক ।

নাম বলো, চেনা নাম—যে নামে ডেকেছিলাম
স্বপূর্ণা মাধবী রাতে সহাস্য প্রদোষে ;
ঘন অরণ্যানীশিরে মৃদু মেঘ ঘুরে-ফিরে
শুনে যেতো যেই নাম অতল সন্তোষে ।
ঝড়ের কত না রাত, কালোর করাত—
চমকে নির্জন চাওয়া, হাতে রাখা হাত ;
কানে শোনা কথা শুনে চকিত নিশীথ-প্রাণ
সহসা বিদ্যুতে :
তমিস্রার দুটি চোখ মরণে আপ্লুত
কারে চায়, কারে চায় ছুঁতে ?
নাম বলো, চেনা নাম—যে-নামে ডেকেছিলাম
হারানো স্রোতের দিন কলহাস্যময় ;
কানে পশে বিস্মৃতির মূঢ় ক্ষীণ শ্রুতি—
চোখের আড়ালে জানি আছে মৃত্যুঞ্জয় ।

ঘনতম অন্ধকার যুগ যুগান্তের
জ্ব'লে ওঠে অকস্মাৎ একটি শিখায় ;
সে-আলো তোমায় চেনে অগ্নিরুচি প্রেম
আহ্বয় বিভায়,

ললাটের দীপ্যমান স্থিরবিন্দু টিপে—
তোমার আঁধার যায় আলোক-যাত্রায়,
আমিই আড়ালে পড়ি আমার প্রদীপে।

ধীরে-ধীরে জাগে মূর্তি পাষাণ-তনয়া ;
অচপল অঙ্গকান্তি ধরে স্বচ্ছতোয়া,
স্রোতস্বিনী-প্রতিচ্ছবি—মধুর মৃদঙ্গ-গীতে
নয়ন ঘনায় ঘোর আনন্ত ইঙ্গিতে :

'কবেকার তুমি ? কবেকার আমি ? কতদিন এই চলা ?
মুছে যায় মেঘ পূর্বমেঘের অপূর্ণ কারুকলা।
এরি নাম দিন, এরি নাম রাত—তবুও এমনি প্রেম
খেলার স্বর্গে কখন পেয়ালী ভাবে বুঝি কী পেলেম।
ম্লান ছায়ালোকে পিছু-ফেরা চোখে কারে খোঁজো দিক্‌ভ্রান্ত ?
স্মৃতির সন্ধ্যা আরো-যে সুদূর বিধুর পথের প্রান্ত !
কারে চিনেছিলে ভুলে-যাওয়া দিনে ? কে আমার মনোলীনা ?
বড় দুঃখের কথা গো প্রেমিক, আমার তুমি অচেনা।

বড় দুঃখের কথা শোনো বলি, না জেনেই তার নাম
পাব একদিন, ধরা সে দেবেই, আমিও ভেবেছিলাম।
হায়রে ভাবনা, হায়রে চাওয়ার আজো অম্লান সুর—
তোমায় দেখেই মনে প'ড়ে গেল আমারো ব্যথা বিধুর।
এখন কী করি বলো তো প্রেমিক, বলো একবার বলো—
মরণ আমার, পাথরের চোখে কিছুতে আসে না জলও !
দেখ এই দেহ, এ-মলিন গেহ, ছিন্ন মুক্তাহার,
পথ চেয়ে-চেয়ে যাত্রা ফুরাতে চলেছে অগম-পার।
বলিহারি যাই সেই অগমের, কী-যে দুরন্ত পণ !

এদিকে আমার একখানি হাত, খ'সে গেছে এক স্তন।
তার দিকে চেয়ে তবু ঘুম নেই, তবুও শঙ্কা জাগে—
যদি সে আসেই, তখন আমায় যদি বা ভালো না লাগে!
নীবীর বাঁধনে কাঁদে যৌবন অজাত রণের সেনা—
জন্ম আমার ধন্য ক'রে সে কখনো কি আসবে না?'

* * *

হঠাৎ সচকিতে গাইল আশপাশ, গাইল বন
এল না মহারাজ—মিছে এ-বধূসাজ পরেছে মন।
শুধু কে আসে যায় অস্ত মেঘ-ছায়,
আকাশ চিনে যায় অচেনা নামে—
গন্ধ-গানে সেই জীবন ভ'রে নেই,
নিজেকে না-চিনেই ভাবি পেলাম।
পিছনে প'ড়ে থাকে, ধূলো কি কাদা মাখে
সাজানো ঘরে-ঘরে অতীত সুখ—
যখন ছলনায় বন্যা ডেকে যায়
নিজেকে চেনা দায় ফেরালে মুখ।
ফাগুন খোঁজে দিক কোথায় ঝিকিমিক
অগম গহনের মানিকঝিল;
তারো তো বেলা যায় অবোধ বালুকায়
কার কাননে গায় লীলাকোকিল!
দীর্ঘ এই পথ পেরিয়ে পর্বত
তবুও চ'লে যায়; কোথায় যায়?
মৌন ভরা গানে আমাকে আমি নামে
তোমাকে তুমি নামে ডেকে বেড়ায়।
এই তো পরিচয় সারা এ-বনময়। ঋতেন্দ্রিয়,
পৃথিবী পেল নাম—পেয়ে তো যা পেলাম, শুনো না প্রিয়।

* * *

কী হোতে কী হ'য়ে গেল—হে দৃষ্টি উধাও,
কোথাকার অদেখার কোন কান্তি নাও ?

এই তো দাঁড়িয়ে আছি—এই চলে চোখ।
তরুতলে বিছালাম, ছায় ! ব'লে ডাকি নাম ;
পাথরের বন্দী বুকে এ কোন আলোক !
এই তো রথের চাকা সূর্যস্তম্ভিত—
আশ্চর্য সুনীল সুর সমুদ্রে হ'ল বিধুর,
আকাশ বাতাস বলে 'আমি আনন্দিত !'

নয় নয়, কেউ নয়, এরা অন্য সুর—
মেলে দিয়ে লঘুপক্ষ অনন্ত সুদূর
চিরযাত্রী রাত্রিদিন ? পথের অন্তিম যতি
হারানো নামের স্বপ্নে খেলায় নিয়তি ?

মুহূর্তে কম্পিত মাটি, শ্রবণে ঝংকৃত :
অন্তরে অমৃতলগ্নে জাগে অতন্দ্রিত।
এই আলো, এ-আকাশ, অসম্পূর্ণ জ্যোতি—
খরশাণ ক্ষুরধার ব্যথার আরতি
কোথায় হারাবে ?
আছে সে—তাই সে বাজে মধুর অভাবে।

এ নয় অপূর্ব শেষ ; এ এক হারানো নাম—
যেতে-যেতে অকস্মাৎ ক্ষণিক বিদ্যুতে
অশ্রুত মন্ত্রীর তার শ্রবণে নিলাম।

এই তো সে-অন্ধকার—এই তো সে গান ?
পাইনি পাইনি আজো, না-পাওয়ার প্রাণ
চলে পথ দলে-দলে, ছায় ধুলো ছায়—
ওপারের বাণী শুনি রথের চাকায় ।
জাগে বন, জাগে স্বর, জাগে রুক্ষ তেপান্তর ;
কোথাকার কোন কন্যা গান গেয়ে যায়,—
'হারানো আলোর শিশু, আয় ফিরে আয় ।'

চতুর্দশপদী

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

চিত্রলোক

সমস্ত শহর মাঝমুখো, ব্যগ্র ভিড় ভেঙে পড়ে
বিমর্ষ সন্ধ্যায় ; উৎকণ্ঠিত লুব্ধ চোখ
চায় তৃপ্তি, চায় তন্দ্রালুতা ; অবরুদ্ধ ঠাণ্ডা ঘরে
একলক্ষ্য ঘেঁষাঘেঁষি ; সমুখে মুখর চিত্রলোক।
নৃত্যগীত, বিগলিত প্রেম, আজন্তবি কল্পনার
গুঞ্জরিত পক্ষসঞ্চালন ; ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্তিনীর
শোভিত শরীরে চোখ পড়ে ; সে-দেহেও তীব্র যাতনার
ছাপ নাকি ? নায়িকার চোখেও কি ক্লান্তি বাঁধে নীড় !

পর্দায় ছবির শেষ। আলো জ্বলে ; এবার বিরতি।
সুরম্য আশ্রয় ছেড়ে রাজপথে নামে বন্য প্রাণ।
ট্রামে-বাসে রুদ্ধশ্বাস ; হট্টগোল, তীব্র হাঁকুনিতে
মুহূর্তে প্রাণান্ত ফের। বেদনার সন্তান সন্ততি
এরা সব। ভুলে গিয়ে সুরভিত দিনের আঘ্রাণ
আজ ছোটে সিনেমায় মৃত মন উষ্ণ ক'রে নিতে

হঠাৎ হাওয়া

আমরা নিস্তেজ বড়ো ; রুদ্ধশ্বাস মনের গভীরে
নিরুত্তাপ সমারোহ, প্রস্ফুটিত শত শতদল
বজ্রতাপে সেখানে মূর্ছিত। ছিন্ন, শতধাবিকল
শরীরের যন্ত্র যতো, অশোকের পলাশের ভিড়ে
উচ্ছ্বসিত হয় না হৃদয়। শূন্য, ভারবাহী মন

মেঘের গুমোট দেখে ভয় পায়, রৌদ্রের ভিতর
শুধু দেখে স্বেদাক্ত তিমির ; জীবনের শান্ত রূপান্তর
মধ্যপথে প্রতিহত, প্রতিরুদ্ধ নীলাকাশ, বন।

তারপর হাওয়া বয়, কী উন্মুক্ত, কী সুন্দর হাওয়া !
রন্ধ্রে-রন্ধ্রে তোলে সুর, গাছে-গাছে মত্ত আলোড়ন।
মুঞ্জরিত সারা দেহ, চমকিত প্রসুপ্ত যৌবন,
বহু লুপ্ত অনুভূতি অকস্মাৎ ফের ফিরে পাওয়া।
হাওয়া যে উদ্দাম হ'লো, অকস্মাৎ হ'লো কি স্বৈরিণী,
মুখে চোখে চুমু খেয়ে, হ'তে চায় জীবনসঙ্গিনী।

একটি কবিতা

আবদুর রশীদ খান

এইখানে এসে এক সীমার প্রস্তর ।

থেমে গেছে এক সুর । তারপর অবসাদ আর অবসর,
নিশুতি রাতের এক ঘুমের মতন ।
স্বপন ভেঙেছে এক ঘুমঘোরে তবুও স্বপন—
প্রগাঢ় ঘুমের এক অতীন্দ্রিয় সুর
(অনেক সমুদ্রতলে আঁধার গহ্বরে ঘুরে
বিলাসী মনের কতো অথর্ব মুকুর ।)
অনেক নির্ঘুম রাতে ঘর ছাড়ে, ঘর গড়ে, ফের ভাঙে ঘর ।

এইখানে এসে এক সীমার প্রস্তর ॥

এইখানে এসে থেমে গেছে এক সুর ।
চেতনার অন্ধকার রাতের দুপুর ॥
ইতিহাস বোবা মূক : অন্ধকার যুগ ।
কান্নার কিনারে এসে থেমে গেছে সুখ ॥

কান্নার কিনার থেকে আরো এক সুখ তবু জাগে ।
উত্তর হাওয়ার শেষে দক্ষিণ হাওয়ার সুর কানে এসে লাগে ॥
অগণিত সীমার প্রস্তর দিয়ে দীর্ঘ পথ এক—
রাত্রির আঁধার চিরে নতুন দিনের অভিষেক ।

অনেক সুরের মিলে একটি আলাপ ॥

অনেক রাতের আর দিনের মিলনে এক চলিষ্ণু জীবন ।
অনেক স্বপন নিয়ে একটি জীবন ॥

জীবন স্বপন নয়, সুর নয়, নয় কভু ঘুমের মতন—
জীবন স্বপন নয় তবুও স্বপন
জীবনের এক দিক। অন্য দিকে রাত জেগে উষার স্মরণ।
অনেক রাতের ভাষা ভোরের আলোয় হয় আমাদের মন॥

সুর থেমে গেলে তবু সুর জেগে থাকে।
কান্নার কিনার থেকে আরো এক সুখ তবু জাগে॥
জীবন তখন এক সুর, ঘুম, স্বপ্নের মতন।

অনেক রাতের ভাষা ভোরের আলোয় হয় আমাদের মন।

বাঘনাপাড়া

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

(Edward Thomas-এর 'Adlestrop' অবলম্বনে)

ঠিক ঠিক। এতক্ষণে মনে হল নাম,
বাঘনাপাড়া। ধূ ধূ করে মাঠ ইষ্টিশন।
অযথা থেমেছে ট্রেন, তারি দীর্ঘশ্বাস
শুনি। আগ্নেয় বৈশাখ। দুপুর নির্জন।

কে যেন কাশছে দূরে—কাঁকা ইষ্টিশন
ওঠে না নামে না কেউ, নেই কোনো সাড়া,
মুহূর্তের আয়ু নিয়ে এ-গাড়ি থেমেছে ;
দেখেছি কেবল নাম, নাম বাঘনাপাড়া।

বনতুলসীর ঝোপে উড়ন্ত ফড়িং
কাঁপে দূরে। ঘাস কাঁপে লাইনের পাশে।
কত না সুদূর মাঠ আকাশের বুকে
শুয়ে আছে। শিশু মেঘ আনমনে ভাসে।

পথিক ঘুঘুর ডাক তবু এরই মাঝে
এক মুহূর্তের আয়ু দিয়ে গেল ভ'রে,
শালিখ কোকিল টিয়া ময়না চড়াই
তারি প্রতিধ্বনি তোলে দূরে দূরান্তরে।

অল্পক্ষণের জন্য

অরবিন্দ গুহ

একবার চোখ তোলো, ভোলো লাল কাইলের ফিতে,
টাইপরাইটারে হাত। আহা, এই পউষের শীতে
চৌরঙ্গীর পাতাঝরা রূপ ছাখো। মনে ভেবে নাও,
বালিগঞ্জ-টালিগঞ্জ-কালিঘাট পেরিয়ে উধাও
শাদা পক্ষীরাজ ট্র্যাম। না না থাক, কেন যাবে ভুলে
সব কিছু? টাইপিস্ট সেনবাবু যখন আড়্লে
চিঠি লেখে, বলো মন, কখনো কি, বলো, মনে হয়,
হাই-হিল কিশোরীর সিঁড়ি ভেঙে ওঠার সময়
তাড়াতাড়ি, সে তো এ-ই, এই গান? ও মন, বলো না
টাইপরাইটারের বুকে কিশোরী পায়ের সুর যায় নাকি শোনা?
আরে বাজে, সব বাজে। গান, চাঁদ, ফুল যতো দেখি,
সব বাজে, ছেলে-ভুলানোর ছড়া, ছেঁড়া, ফাঁকা, মেকি।
বাজে, মেকি? ধরো, যেন তা-ই হ'লো। ছাখো, লাল আলো
পার্ক স্ট্রীটে। এই ভিড়, তবু ছাখো স্তব্ধতা ছড়ালো
কতো দূর, দীর্ঘ দূর, ট্রাফিকের হাজার চাকায়,
কান যদি না-ও পাতো, তবু তীক্ষ্ণ, স্পষ্ট শোনা যায়
প্রতীক্ষা, প্রার্থনা, চুপ : জ্ব'লে ওঠো, হে সবুজ আলো।
শীতের বিশাল একা অজগর, ভেঙে যাও, চলো
যে যার নিজের পথে। মিথ্যে হোক, কথা শোনো, তুমি
ভাবো, একবার ভাবো, এই মাঠ তীব্র তৃণভূমি
হ'য়ে ছুঁতে পারে, ছুঁয়েছে তো কল্পনার আকাশের
নীল। আরেকটু শোনো, আরেকটু। তোমার পথের
শেষ প্রায় এসে গেলো। বাতাসের শীতে-শাদা থাবা

ঝরায় গাছের পাতা। বিকেলের রোদ্দুরের আভা
পিছনের চৌরঙ্গীর অপরূপ আকাশে উড়ুক,
মনে কি পড়ে না তবু কোনো চোখ, কোনো ঠোঁট, মুখ ?

দৃষ্টি-ছন্দ

চিত্র গুপ্ত

১

দীঘল আঁখিতে মেঘল তোমার দৃষ্টি, নয়ন-দি,
ঝেঁপে নেমে এলো বৃষ্টি আমার প্রাণের দিগন্তে,
মরু-মন ছেয়ে মধুর সবুজ ঘাসের জয়ন্তী।

২

অতল ঘুমের পরও গীতল চোখে
কী যেন সে ছায়া-ছল প্রতি পলকে
কেঁপে-কেঁপে খেলা করে ; রূপকথা কি ?
তা যদি না হয় তবে স্বপ্ন-পাখি !

৩

তোমার চোখে ও-কিসের ঝড়
এলোমেলো হাওয়া উন্মুখর ?
শান্তি দেয়নি, শান্তি দেয়নি,
হায়, বেদুইন, ভাঙলো ঘর !

ইতিহাস

পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য

অবরুদ্ধ নগরীর বিধ্বস্ত প্রাকারে
ব'সে আছি নির্বিকার অসহায়তায়।

গাঢ় হাওয়া, বারুদের গন্ধে ভারী—
ভগ্ন স্তূপ এখানে-ওখানে,
অবসন্ন সৈনিকের কোলাহলে
নিদ্রা নামে, মৃত্যু ছায়া মেলে।

এ-দুর্গ দুর্গম ছিল উচ্চকিত গম্বুজে মিনারে
বীরদের নিষ্ঠায় প্রত্যয়ে এ-দুর্গ দুর্জয় ছিল,
সমৃদ্ধ এ-জনপদে প্রাণসম্পদের
মহিমার শিল্পের মতন ইতিহাসে।

হে জীবন!
হে মহাজীবন!
মৃত্যু হ'তে কোন শিল্প জন্ম দেবে আজ?

সূর্যস্নান

বটকৃষ্ণ দাস

দূরগামী জাহাজের সুদীর্ঘ মাস্তুল
দিগন্তে বিলীন হ'লো। সমুদ্রসৈকতে
অসংখ্য ঊর্মির নীলে বিচিত্র বনের সমারোহে
কতো দিন কতো রাত তবু
নিটোল গুক্তার স্বপ্নে জীবনের প্রচ্ছদ এঁকেছি।
তারপর কবেকার ঝড়ে
ছিন্নপত্র উড়ে গেছে ; রক্তের ফসল বুকে নিয়ে
সময় গিয়েছে চ'লে বাঘিনীর মতো
পদচিহ্ন মুছে-মুছে বালির বাসরে।

তুমি নেই। ধূ ধূ মাঠ ; নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে
পত্রহীন শীর্ণ দেবদারু।
বিক্ষিপ্ত বাতির ঝাড়, পালঙ্কের বিস্রস্ত বিছানা,
জানালায় ছিন্ন শিখীপাখা,
বিচূর্ণিত আসবাব, চৈনিক শিল্পের ভগ্নস্তূপ,
কক্ষে আর কক্ষান্তরে শূন্যতার আঁধার ক্রন্দন।

দূরের বন্দর থেকে সমুদ্রের হাওয়া
জ্যোতির্ময় সূর্যের সকালে
শস্যের উৎসব আনে,
ভেসে আসে নাবিকের গান।

তোমার কেশের লুপ্ত অরণ্যের ঘ্রাণ,
চোখের নিশ্চিহ্ন নীল, শুষ্ক ঠোঁটে গতায়ু গোধূলি,

ছায়াচ্ছন্ন তমুর তুষার
সমস্ত উত্তীর্ণ হ'য়ে—এবার সময়।
সুনীল সমুদ্রস্নানে রাহুমুক্ত প্রাণ
ইন্দ্রনীল দিগন্তবিস্তারে
সর্বত্র পড়ুক ঝ'রে। তিমিরের অন্তিম শয্যায়
জ্বরের রাত্রির শেষে দেখা দিক হীরক রৌদ্রুর॥

একটি স্বপ্নলোক

মৃণালকান্তি

ঝাঁ ঝাঁ রোদে ঝিমায় প্রহর,
অলস পায়রা আলিসার 'পর।
নিস্তব্ধ নিঝুম পথ-ঘাট
দূরে উদাস শূন্য ছপুরের ধূ ধূ মাঠ—
একা একা স্বপ্ন বুনি,
তোমার পায়ের ধ্বনি
হঠাৎ শুনি।
ভেসে ওঠে তোমার মুখ
মেঘালু নীল চোখ
একটি স্বপ্নলোক!

দিনের পর এলো দিন,
বিশাল ডানা মেলে এলো কত কালো রাত।
ঝিঁঝি-ডাকা মাঠের বুকে
গাঢ় ঘুম
আর মাঝে-মাঝে বাবলার বনে
ডাকে রাতের পাখি—
নিবলো কতো তারা,
মেঘের বুকে
ডুবলো বাঁকা চাঁদ,
রাত্রি হ'লো সারা—
কত স্বপ্ন হ'লো ভোর!
রৌদ্র এলো,
এলো বাতাস এলোমেলো,
নিবলো ঘরের আলো

প্রহর হ'লো শেষ !
তবু তোমার নামের ধ্বনি
কেবল শুনি।

শুকনো ডালে কাকের কর্কশ ডাক,
হঠাৎ হাওয়ায়
হলদে পাতায় ঘূর্ণিপাক।
বনের বুকে ক্লান্ত হাওয়ার শিষ—
চিল-আঁকা নীল চৈত্রের আকাশ,
নিরালা দুপুরে নির্জন অবকাশ ;
এই স্তব্ধ মুহূর্তে—
তোমার কথা ভাবি
হঠাৎ শুনি
তোমার পায়ের ধ্বনি !
মনের পথে চাই,
ধূ ধূ ফাঁকা
কোথাও কেউ নাই।
পাতা ঝরে,
ছায়া নড়ে।
ছিন্নমেঘের দল,
রোদের সোনায়
আকাশ টলমল।
উদাস ঘুঘুর ডাক—
গড়িয়ে পড়ে বেলা।
দুপুর দেয়
দূরের ইশারা,
নিশীথে নীল তারা।

তিনটি কবিতা

বুদ্ধদেব বসু

যৌবন ও জরা

একবার তখন ভাবিনি
এ যে নয় আনন্দের দান,
এ যে নয় অমৃতসমান,
যখন জীবন ভ'রে ছিলে,
হে সুন্দরী, হে বিশ্বমোহিনী।

তুমি দিলে, তুমি শুধু দিলে ;
কেটে গেলো অর্ধেক জীবন।
এখন তোমার আমি ঋণী ;
সব শোধ করি তিলে-তিলে,
হে সুন্দরী, হে বিশ্বমোহিনী।

দ্বিতীয় যৌবন

ফিরে-ফিরে স্মৃতিরে ডেকো না।
নিজেই সে বড়ো গুরুভার ;
যত তার বিস্তীর্ণ ভাঁড়ার
তত বেশি নিষ্ঠুর ইঁদুর
মুহূর্তের তন্তু খুঁটে খায়।
তাই সব হৃদয় শুকায়।

সম্ভবের আশাও রেখো না।
স্বর্গ নেই কোনো ভবিষ্যতে,

মুক্তি নেই জনতার পথে,
নেই কোনো সংঘের মন্দিরে।
সব আসে ঘুরে-ঘুরে ফিরে,
স্বপ্ন আসে, স্বপ্ন ঝ'রে যায়।

শিশুর মৌলিক মুখে শেখো
প্রজ্ঞার প্রথম পরিভাষা ;
যেটা নেই, কখনো হবে না,
তা-ই যদি দুরন্ত পিপাসা,
তবে এই প্রাণের সংসারে
যা পেয়েছো তা-ই তো নির্ভুল।

তবু যদি মনে হয় ভুল
নীলিমায় নিজেরে মিলাও,
মুছে যাক ব্যবহার্য নাম ;
হাওয়ার আনন্দে ব'য়ে যাও
তারার কপালি অন্ধকারে ;
তরঙ্গেরে বলো, 'আমি আছি,'
পৃথিবীরে : 'আমিও ছিলাম।'

অসম্ভবের গান

বৃথাই জপিয়েছি তোমারে, মন,
থামাও অস্থির চ্যাঁচামেচি।
কোথায় অর্জুন! কোথায় কামরূপ!
এক বসন্তেই শূন্য তূণ।

এক বসন্তেই শূন্য তূণ ?
তাহ'লে আজো কেন শান্তি নেই ?
কেন বিচক্ষণ যুধিষ্ঠির
পাঞ্চালীরে রাখে পাশায় পণ ?

কোনো বিচক্ষণ যুধিষ্ঠির
জানে না কেন এই পরিশ্রম,
জানে না সন্ধ্যায় ক্লান্ত পাখা
হঠাৎ কাঁপে কোন আকাঙ্ক্ষায়।

হঠাৎ কাঁপি কোন আকাঙ্ক্ষায়—
বৃথাই জপালাম তোমারে, মন—
উন্মাদিনী পাশা বরং ভালো,
আজো কি চিত্রাঙ্গদার আশা ?

বরং প্রোজ্জ্বল জুয়োর চোখে
গ্যাখো-না ডুব দিয়ে কোথায় তল,
কিংবা মদিরার উদার বুকে
পাবে তো অন্তত অন্ধকার।

এখানে কিছু নেই, অন্ধকার,
শূন্য তূণ এক বসন্তেই,
এ-বনে কেন তবে আবার খোঁজো
অনিশ্চয়তার অসম্ভবে !

অনিশ্চয়তার অন্বেষণে
পাঞ্চালীরে পেয়েছিলে সেবার,

সে আজ এত দূর বিখ্যাত যে
স্বয়ং কৃষ্ণের সে-ই মধুর।

কসল অন্যের, তোমার শুধু
অন্য কোনো দূর অরণ্যের
পন্থহীনতায় স্বপ্নে কেঁপে ওঠা
কোন অসম্ভব আকাঙ্ক্ষায়।

স্বপ্নে ওঠে রোল—কোথায় কামরূপ
কাঁপছে চিত্রাঙ্গদার ঠোঁটে!
হে বীর, ভাঙো ভুল! ব্রহ্মচারী তুমি?
আবার বসন্তের হুলুস্থুল।

আবার বসন্তের হুলুস্থুল!
ব্রহ্মচারী তুমি, সব্যসাচী?
থামে না চাঁচামেচি! যদি অসম্ভব,
তবে এ-তৃষ্ণার কোথায় মূল?

তিনটি চীনা কবিতা

দিলীপ দত্ত

১

চুংজু, দোহাই তোমার,
বাড়িতে ঢুকে আমাদের গোলাপগাছগুলো
নষ্ট কোরো না।
গোলাপের কথা ভাবছি না,
কিন্তু মা-বাবাকে ডরাই।
তোমায় খুব ভালোবাসি চুংজু ;
কিন্তু মা বাবা কী বলবেন।
সত্যি আমার বড্ড ভয় করে।

দোহাই তোমার, চুংজু,
পাঁচিল ডিঙিয়ে এসে
পেয়ারা গাছ নষ্ট কোরো না।
পেয়ারার কথা ভাবছি না,
কিন্তু ভাইয়েদের ভয় করে।
তোমায় সত্যিই ভালবাসি চুংজু,
কিন্তু ভাইয়েরা কী বলবে
সত্যি আমার বড্ড ভয় করে।

চুংজু, দোহাই তোমার,
যে-গাছগুলো পুঁতেছি
বাগানে ঢুকে তা নষ্ট কোরো না।
গাছের কথা ভাবছি না,
কিন্তু লোকে কী বলবে।
তোমায় খুব ভালোবাসি চুংজু ;

কিন্তু লোকে কী বলবে।
সত্যি আমার বড্ড ভয় করে।

(লেখক অজ্ঞাত পৃঃ পৃঃ ৩)

২

শীত চ'লে গেছে চুংনান থেকে, বসন্ত এসে গেল,
হলুদ রঙের গাছের ফাঁকে-ফাঁকে নীল রঙের খেলা।
হাজার হাজার গাড়ি চলেছে,
কত হাজার ঘোড়সওয়ার,
কিন্তু পাহাড়ের দিকে মুখ ফেরাও,
কোথাও একটি মানুষ নেই।

(পো চু-ই : ৭৭২-৮৪৬)

৩

শাদা পায়রাটা
আকাশে এক চক্কর দিয়ে
চ'লে যায়।
তারপর মস্ত আকাশটাকে
আরো মস্ত মনে হয়,
আরো ঘন নীল।
একটা কালো মাছি,
কানের কাছে ভনভন করে
ঘুমোতে দেয় না।
আর গ্রীষ্মের শুকনো দুপুর
আর কাটতে চায় না।
চারদিক নিঝুম ;
গ্রীষ্মের দুপুর
মনে হয় যেন শেষ নেই যেন শেষ নেই।

(লেং মে-চিয়া আধুনিক)

যদি মনে করি

বাণী রায়

যদি মনে করি—
নিদ্রাহীন তোমার শর্বরী
অবিরত প্রার্থনায়, আত্মার অব্যক্ত কামনায়,
নর্তকী স্বপ্নের পায়ে সূক্ষ্ম তন্তুসম
চিন্তায় জড়ায়ে রাখে উর্ণনাভ প্রেম,
আঁখিতে আসে না ঘুম ;
শোকার্তা রজনী তার কৃষ্ণপক্ষ কেশ
একে-একে ছেঁড়ে
বিনিদ্র শয্যার পাশে ;
বিরহের তীরদীর্ণ চলিষ্ণু চরণে
অন্ধকার রক্তপাতে লিখে যায় নাম
কালের অঙ্গুলিপ্রান্ত ।
লিখে যায় নাম,
যে-নামেরে সারাদিন তুমি ভুলে থাকো ।
আমার নিষিদ্ধ নাম আরক্ত অক্ষরে
থরোথরো কম্পিত যে সারারাত্রি জাগে
জাগর নয়নে ;
যদি মনে করি
নিদ্রা হয় পলাতকা আমারও নয়নে ।
তাই ভুলে থাকি, বন্ধু, তাই ভুলে থাকি
অণু পরমাণু দিয়ে,
চূর্ণ অস্তিত্বের বিন্দু-বিন্দু ক্ষয়ণের কাল-পঙ্কস্রোতে
নিত্য তুমি মনে রাখো,
মনে রাখো তুমি ।

যদি মনে করি
ক্লান্ত দেহে আরো ক্লান্তি চাও
শান্তি নেই ব'লে তাই।
জীর্ণতর করো তনু অবিরত কাজে
তপ্ত দিন ভিজে ওঠে ললাটের স্বেদে ;
স্মৃতিদগ্ধ আক্রমণ করো প্রতিরোধ
কর্মের প্রাচীর গেঁথে।
ছুটে চ'লে যাও
সভার আড়াল সেই দৈনন্দিন কাজে।
বিরাট প্রাচীর, বন্ধু, ছুটি বক্ষোমাঝে,
পরিখা, বৈরাগ্যছল।
ভুলে থাকা নয়,
ভোলানো নিজেকে শুধু মনে করা থেকে।
মুহূর্তের হাত ধ'রে অনন্তের বাহু ছেড়ে দূরে চ'লে যাওয়া।
যদি মনে করি,
আমারও যে দিন হয় শান্তিহীন
তোমার শ্রান্তির স্বেদ আমার বিশ্রামে
করে, অসংবৃত করে।
তাই মনে করি
আমারে রাখোনি মনে ;
কণ্টকিত তোমার জীবনে
চূর্ণ দীর্ণ করিয়াছে প্রতিমা আমার,
কর্মের প্রহার।

যদি মনে করি—

নগরীর পথ নয়, ট্রাম বাস নয়,
ক্রমিক সংখ্যার অঙ্ক শঙ্কিত দেয়াল
তোমার আমার মধ্যে ;
নয় রাজপথ—বিশাল সাগর বয়,
ক্ষুব্ধ পারাবার ;
নীল জলে মুক্তা নাই; নাই শুক্তিকণা।
আছে শুধু জলচর বীভৎস করাল,
দংষ্ট্রা জলে অস্ত্রসম,
আছে সিন্ধু শুধু,
শুধু নাই চিরন্তন সাগরের সাগা,
সিন্ধুর প্রেমিক স্বপ্ন ।
বাসনার মুক্তামালা লবণাক্ত হাতে
তুমি আসো নাই কোনো গভীরে ডুবুরি ।
আমিও জ্বালিনি
আলোছায়া-ঝিলিমিলি প্রদীপের আলো
নারিকেলকুঞ্জতলে
নাবিক স্বামীর পথ চেয়ে ।
শুধু করে ভিড়
কংক্রীট পাথর ইটে আস্তৃত জলধি
ভীষণ রহস্যবহ প্রাণকেন্দ্রমূলে ।
যদি মনে করি
আমার সকল সত্তা শুষ্ক ফুল ঝরে
বাস্তবের ধূলিকায় ।
তাই মনে করি
তুচ্ছ এই ব্যবধান একটু পথের
বাষ্পযানে পার হবে ;

তুলে নেবো অবহেলে টেলিফোন।
বাধা হবে দূর।
হায়, মনে করি
শুধু তুচ্ছ ব্যবধান দূর করা যায়,
তবু তুমি দূরে থাকো, তবু ভুলে থাকো তো আমায়।

পুনর্লিখিত কিশোর কবিতা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

অসময়ে আহ্বান

মরণ, আমারে দিয়েছো আজিকে ডাক।
নান্দীমুখেরও বহু বিলম্ব আছে ;
সকালে বাজায়ে সন্ধ্যাবেলার শাঁখ
মিয়াদীরে বলো এখনি আসিতে কাছে ?
পাতাঝরা বনে তুষার গলেছে সবে।
কচিতরুর সন্ধান নিতে হবে ;
অন্তত যূল ফুটুক অঞ্জলি গাছে ॥

ধ্যানে আজকাল মানসীরে প্রায় হেরি ;
পেয়েছি মূর্তিপূজার প্রত্যাদেশ।
উজ্জীবনের যদিও অনেক দেরি,
তবু প্রতিমার কাঠামো হয়েছে শেষ।
ঘটুক মিলন সাধ্যে এবং সাধে ;
তার পরে দিও দীক্ষা শূন্যবাদে,
তার পরে মুখে তাকায়ো নির্নিমেষ ॥

দুর্মদ আজো রয়েছে ঊর্ধ্বশির ;
এখনো জগতে ব্যক্ত অত্যাচার ;
অবমানিতের অবল অশ্রুনীর
ঝরে ঘরে ঘরে ; দেশে দেশে হাহাকার।
স্বার্থ এখনো মরে নাই অপঘাতে ;
বিরাজিত রাজদণ্ড তাহার হাতে ;
অপ্রতিহত মিথ্যার বিস্তার ॥

গতানুগতিক আশ্বাসে এত কাল
বিমুখ থেকেছি শাসননাশন ব্রতে ;
কোষে নিবদ্ধ খরধার করবাল,
মোহন মুরলী খসে নি হস্ত হতে।
আজো অনুভবে নিহিত সম্ভাবনা,
নিরুদ্দেশের অসীম উন্মাদনা
উহ্য যেমন বন্দরে বাঁধা পোতে॥

কান পেতে শুনি যেখানে দিগন্তরে
পুরাতন বাঁধ ভাঙে বিদ্রোহবানে ;
দেখি ঝঞ্ঝার আয়োজন অম্বরে ;
আমিও আহূত বুঝি মুক্তিস্নানে।
অনুমতি দাও আরো কিছু কাল থাকি
বিশাল বিশ্বে বিস্ফারি দুই আঁখি ;
ডেকো না, মরণ এখনি সন্নিধানে॥

আদি রচনা ১৩৩০

প্রতিধ্বনি

নিষ্ফল স্বেদ, বৃথা নির্বেদ,
মিছে কাঁদা ;
যাচক হস্ত অনভ্যস্ত
মৌনী বীণারে মিছে সাধা।
সান্ত্র আলসে কাটালেম দিনগুলি ;
উপভোগে গেছি বেদনার রীতি ভুলি ;
ভ্রষ্ট লগ্নে ঝাড়িয়া যুগের ধূলি
মিছে আজি তার বাঁধা।

অশ্রু যদি, হিম আঁখি,
ব্যর্থ প্রয়াস, বৃথা কাঁদা ॥

বিস্তৃত নিশীথে জাগিবে না চিতে
সান্ত্বনা ;
কবিবে না নীড় নিরাসক্তির
নম্র মহিমা বিরচনা ।
তীব্র নিষাদে হবে না সহসা মূক
বিরূপ সত্তার প্রগল্ভ কৌতুক :
অনুকম্পায় মহাকাশ জাগরূক,
দিবে না উদ্দীপনা ।
সংগীতশেষে অঙ্কুরান রেশে
জাগিবে না আর সান্ত্বনা ॥

একদা প্রভাতে কঠোর আঘাতে
বীণাখানি
অতর্কিত সুরে সমে ঘুরে ঘুরে
পেয়েছিলো খুঁজে ধ্রুব বাণী ।
আজি অপরের দুরাগত রাগালাপে
শিথিল অঙ্গী মুহুর্মুহু শুধু কাঁপে
কভু অভিমানে, কখনো বা পরিতাপে,
মূর্ত মূর্ছি হানি ।
দুঃখের ভয়ে ধরি নি হৃদয়ে,
তাই হতবাক্ বীণাখানি ॥

আদি রচনা : ১৩৩২

ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের কবিখ্যাতি পশ্চিমে আজ লুপ্তপ্রায় দেখে আমাদের মনে বেদনাবোধ অনিবার্য। এ-প্রসঙ্গে এডওআর্ড টমসনের খেদোক্তি এই যে ধূসর এলিঅটী যুগে ঠাকুরকবির সমাদর অসম্ভব, কিন্তু সেটা-যে প্রকৃত কারণ নয়, কিংবা প্রধান কারণ নয়, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ পুনরায় পড়লেই তা প্রাঞ্জল হয়। এখানে, এই কাব্যসংগ্রহেই, এই অবক্ষয়ের প্রকৃত কারণ অন্তর্নিহিত। প্রথম কথা এই যে রচনার দিক থেকে, শিল্পকর্মের দিক থেকে গীতাঞ্জলির প্রাথমিক কৃতিত্ব পরবর্তী ইংরেজি গ্রন্থে অনুপস্থিত। ইংরেজি গীতাঞ্জলি মূলের তুলনাতেও মহত্তর, জাত-বাঙালিরও বরেণ্য। আমি আবার তুলনা ক'রে দেখলাম;—কোনো-কোনো কবিতা, যা বাংলায় গৌণ, নিষ্প্রভ, ঘোর রবীন্দ্রভক্তেরও অল্প-চেনা, যে-সব গান আজকের দিনেও কখনো প্রায় শুনি না, ইংরেজি রূপান্তরে সেই সব কবিতাই দীপ্যমান। যেমন ৮০ এবং ৮৭ নম্বর কবিতা—'আমি শরৎশেষের মেঘের মতো' (খেয়া), 'আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই' (স্মরণ)—বাংলার তুলনায় ইংরেজির স্বচ্ছতা এখানে স্বতঃস্ফূর্ত। উপরন্তু যেসব রচনা বাংলায় অনির্বচনীয়, অনুবাদে তাদেরও কোনো ক্ষতি হয়নি; শুধু তা-ই নয়, যেহেতু এই কবিতাবলী ভগবানের পূজা, মূলের কারুকলার ইন্দ্রিয়সুখবর্জিত হ'য়ে বরং এখানে নগ্ন আবেগ তীব্রতর আঘাত করে। সাহিত্যক্ষেত্রে একে প্রায় অঘটন বলতে হয়।

কিন্তু এই অঘটন দ্বিতীয়বার ঘটেনি, সেটা আশা করাও অন্যায় হ'তো। শিশু এবং ক্ষণিকা, অন্তত ইংরেজি-সাহিত্যে যে-দুটি গ্রন্থের তুলনা নেই, বিদেশীর বাংলা শেখার পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ যে-দুটি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ইংরেজিতে তার মৌল বৈশিষ্ট্যের অনুমান সুদূর অসম্ভব। পরবর্তী অন্যান্য অনুবাদ বিষয়েও এই কথাই প্রযোজ্য। নাটকের মধ্যে উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছে শুধু ডাকঘর। এই পরোৎকৃষ্ট নাটিকাটি এমনই নির্ভার, এখানে

Collected Poems and Plays by Rabindranath Tagore. Macmillan. 15s.
Three Plays (Muktadhara, Natir Puja, Chandalika) tr. by Marjorie Sykes. Oxford University Press, Rs. 6/-

এতই সহজে এবং স্বল্পায়তনে মানবজীবনের গভীরতম ব্যাকুলতা ব্যক্ত হয়েছে যে, অনুবাদে যদিও পরিমার্জনার অবকাশ ছিল, অন্তত আমি তো ইংরেজিতে প'ড়েও পবিত্র আনন্দের অশ্রুপাত না-ক'রে পারিনি। কিন্তু চিত্রা, অর্থাৎ চিত্রাঙ্গদা, অতিকথনে ভারাক্রান্ত, গঠনে দুর্বল, আর তার উপর এই আশ্চর্য কাহিনীর টেনিসনীয় পরিসমাপ্তির পাণ্ডুর শোচনীয়তা, বাংলায় যা আবাল্য আমাদের মনঃপীড়ার কারণ, ইংরেজিতে তার সান্ত্বনা কোথায়? অন্তত বিসর্জন বা ফাল্গুনীতে তো নেই, কেননা অনুবাদ এখানে আক্ষরিক ব'লেও কিংবা আক্ষরিক ব'লেই, যথোচিত প্রাণসঞ্চার হয়নি, ফাল্গুনীর পুষ্পিত গীতিগুচ্ছ ইংরেজিতে কী বিশীর্ণ।

বিভিন্ন গ্রন্থের আন্তরিক মূল্য কোনো কবিরই সমান হয় না, কিন্তু অনেক সময় প্রকরণের বৈচিত্র্যেই বহুলতা সার্থক হয়। এ-কথা বাংলায় রবীন্দ্রনাথের পক্ষে বিশেষভাবে সত্য, কিন্তু ইংরেজিতে এই বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব নিঃসন্দেহে তাঁর পশ্চিমী খ্যাতির পরিপন্থী। যে-গদ্যছন্দ গীতাঞ্জলিতে বিষয়-গুণে সংগত ছিল, পরবর্তী অন্যান্য কাব্যের অনেক ক্ষেত্রেই তা অনুপযোগী। আর, যদি উপযোগীও হ'তো, তাহ'লেও অবিরল গদ্যকবিতার ক্লান্তি থেকে নিস্তার ছিলো না। হুইটম্যানের ভাবে আর ভঙ্গিতে বিরোধ নেই, শক্তিও অসামান্য, কিন্তু লীভস অব গ্রাস একসঙ্গে কতক্ষণ পড়া যায়? তেমনি, গীতাঞ্জলির পর দি ক্রেসেন্ট মুন যদি-বা উপভোগ্য, দি গার্ডেনারে যদি-বা কোনো রস্ত মেলে, এর পরে আর বেশিক্ষণ প্রাচ্য কবির সহযাত্রী হ'তে প্রতীচী পাঠকের উৎসাহ আশাতীত। এবং, বলা বাহুল্য, বিদেশী ভাষার একেবারে মর্মস্থলে পৌঁছানো প্রতিভাবানেরও অসাধ্যপ্রায়; এমন-যে উৎকৃষ্ট গীতাঞ্জলি তাও যে উৎকৃষ্টতর হ'তে পারতো তার প্রমাণ মেলে ৬৭ নং কবিতায় ('Thou art the sky and thou art the nest as well') রবার্ট ব্রিজেস-এর সূক্ষ্ম-নিপুণ হস্তক্ষেপে। এই কবিতার ব্রিজেস-কৃত পাঠান্তর তাঁরই সম্পাদিত "স্পিরিট অব ম্যান"-এ মুদ্রিত আছে, ইএটস-এর 'অক্সফোর্ড বুক অব মডার্ন ভর্স'-এও সেটাই সংকলিত। দুটো মিলিয়ে পড়লে বিস্মিত হ'তে হয়।

কবিতার অনুবাদের সমস্যা এখানে আলোচ্য। কখনো মনে হয় যে সব কবির, বা সব কবিতার, ভাষান্তর হতেই পারে না। যে-কবিতার শরীর থেকে

বক্তব্যের বিচ্ছেদ সম্ভব, অর্থাৎ যার সারাংশ গদ্যে লিখেও বোঝানো যায়, সেখানে ভাষান্তরে কিছু-না-কিছু ধরাই পড়ে। কিন্তু যেখানে রূপের সঙ্গে বস্তুর মিলন এমনই একান্ত যে প্রথমটা হারালে দ্বিতীয়টাও হারায়, সেখানে অনুবাদের সার্থকতা বিরল। যেমন বোদলেয়ারের বক্তব্যের অংশ রীতিমতো স্পর্শসহ, এমন কি তাতে উপন্যাসেরও উপাদান প্রচ্ছন্ন; তাই অনুবাদে তাঁর ধ্বনির প্রতিধ্বনি যদি না জোটে, অন্তত তাঁর মনের পরিচয় পাই, অন্তত তাঁর আকার চিনতে পারি। কিন্তু র‍্যাঁবো কিংবা মালার্মের কিছুই প্রায় পৌঁছয় না। অর্থাৎ, শব্দের জাদুবিস্তার যে-কবিতার যত বেশি নির্ভর, ততই তার অনুবাদের উপযোগিতা ক্ষীণ এবং রবীন্দ্রনাথের লৌকিক রচনাবলী যেহেতু বহুলত এই ইন্দ্রজালেরই উদাহরণ, তাই, স্বয়ং অনুবাদক হ'য়েও, অনুবাদের তুলনাতেও তিনি ক্ষতিগ্রস্ত। শুধু ক্ষণিকারই নয়, বলাকা কিংবা লিপিকার ক্ষেত্রেও মূলের সঙ্গে ব্যবধান দুস্তর। বাঙালির মনে কৃষ্ণকলির মোহবিস্তার ইংরেজি পাঠকের কল্পনারও অগম্য।

অতএব রবীন্দ্রনাথ এখন নতুন অনুবাদের মুখাপেক্ষী। এই কঠিন কাজ, বলা বাহুল্য, যথার্থরূপে সম্পন্ন হ'তে পারে তাঁরই হাতে, যিনি, শুধু যোদ্ধা নন, প্রেমিক নন, শুধু জন্মসূত্রে অনুবাদের ভাষার অধিকারী নন, উপরন্তু সেই ভাষায় অত্যন্ত কারিগর, নিজেও শিল্পী। গীতাঞ্জলি, শুনতে পাই, ইংরেজির তুলনাতেও ফরাসি ভাষায় অংশত শ্রেয়তর—নিশ্চয়ই তার কারণ আঁদ্রে জীদ-এর প্রশিক্ষিত লেখনী। ব্রিজেস-এর ঐ একটি কবিতার পরিমার্জনাও শিক্ষাপ্রদ। যদি ইংরেজি ভাষার কোনো অভিজ্ঞ আধুনিক কবি বাংলা শিখে অনুবাদকর্মে হাত দেন, কিংবা, সেই উদ্দেশ্যে, বিশ্বভারতী বৃত্তি দিয়ে তেমন কাউকে আহ্বান করেন, তাহ'লে বিশ্বসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পুনর্জীবন শুধু কালের খেয়ালে আর নির্ভর করে না।

সেই শুভযোগের প্রত্যাশায় ব'সে না-থেকে যাঁরা এই সৎকর্মে সাহসী, ইতিমধ্যে তাঁদের চেষ্টাও লক্ষ্যণীয়। এডওয়ার্ড টমসন এবং ভবানী ভট্টাচার্যের পরে মার্জরি সাইক্স এ-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী সাইক্স, বলা বাহুল্য, এ-পথের বিঘ্ন বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন, বিনয়ের অভাবও তাঁর নেই, কেননা 'খ্রী প্রেক্ষে'র ভূমিকায় তিনি মেনে নিয়েছেন যে এই ফুল বিদেশী হাওয়ায় শুকিয়ে

যায়। শুকিয়ে যাতে না যায়, তারই ব্যবস্থা অনুবাদকের কর্তব্য, পাঠকের এই স্বগতোক্তি অবশ্য অনিবার্য, কিন্তু এখানেও তিনি নিরুত্তর, কেননা অনেক গান 'অসাধ্য ব'লে' বর্জিত, আর কোনো-কোনোটি নাট্যপ্রসঙ্গে অপরিহার্য ব'লেই উদ্ধৃত, যদিও 'the translation is very imperfect'। এর পর সমালোচকের কিছু বলার থাকে না, তবে সাহিত্যে যাঁরা রসের তেমন পিপাসু নন, তত্ত্ব পেলেই খুশি, এই গ্রন্থ তাঁদের পক্ষে উপকারী।

রবীন্দ্রনাথের বৈদেশিক অবক্ষয়ের আরো একটি কারণ আছে। 'কলেক্টেড পোএমস অ্যাণ্ড প্লেজ'-এ যেহেতু প্রেম, বাৎসল্য, হাস্য, ওজঃ, এই সব মানবিক ভাবাপ্লুত রচনা বহুলাংশে নিস্তেজ, তাই এখানে বিষয়ের কোনো বৈচিত্র্য মেলে না, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বক্তব্যেরও ক্রমবিকাশ নেই। আছে, প্রত্যাশিত পরিণতির বদলে, সম্প্রসারণ। কবি তাঁর সব কথা গীতাঞ্জলিতেই বলেছেন, ডাকঘর তারই একটি সূত্রের নাট্যরূপ, সাধনা তারই দার্শনিক ভাষ্য। অন্যান্য রচনায় নতুন কোনো বক্তব্য ফোটেনি, এবং কিছু দূর অগ্রসর হ'লে যে-কোনো কবিতা অন্য যে-কোনো কবিতা ব'লে ভ্রম হয়। গীতাঞ্জলির বক্তব্যের মূল্যেই ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ মূল্যবান, কিন্তু সেখানে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁরই অনূদিত কবির, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সাক্ষাৎ উপনিষদ। পশ্চিমে কেউ-কেউ ভাবতে পারেন যে একেবারে মূল উৎসেই পান করা শ্রেয়।

কিন্তু এখানেই রবীন্দ্রনাথ জয়ী। উপনিষদ জানলে, ভারতীয় মরমীদের জানলে, তবু তিনি তৃষ্ণায় বারিস্বরূপ। মূলত তাঁর যা বক্তব্য, তা এতই মহৎ, এতই বিস্ময়কর, এতই সহজ ক'রে বলা, যে সেই কথা শুনতে গেলে যেমন হৃদয়দল উন্মীলিত হয়, মন দিয়ে শুনতেও তেমনি গভীর অভিনিবেশ প্রয়োজন। অনেকে আছেন গীতাঞ্জলি যাঁদের তরল লাগে, দ্বন্দ্বহীন ব'লে তৃপ্তি দেয় না, সংগ্রামের ক্ষতচিহ্নের অভাব তাঁদের বিমুখ করে, কিন্তু তাঁরা, খুব সম্ভব, শুধু আপাতদৃষ্টিতে দেখেছেন, কিংবা তাঁদের বিশ্বাস যে বিশেষ-কোনো সংঘবদ্ধ ধর্মের নির্দিষ্ট নিয়মাবলী ছাড়া ভগবানের করুণালাভ অসম্ভব। বস্তুত গীতাঞ্জলি সুলভ জীবন্মুক্তির কাহিনী নয়—ও বস্তু কখনোই সুলভ হয় না; বস্তুত গীতাঞ্জলির ১০৩টি কবিতার মধ্যে একেবারে মিলনের কথা মাত্রই

কয়েকবার শোনা যায়। অধিকাংশই বিরহের গান, সন্ধানের, আকাঙ্ক্ষার, প্রতীক্ষার। কিন্তু এই বিরহচেতনাও মধুর, ভগবানের সন্ধানেও মানুষ ধন্য। ('তোমার সুর শুনায়ে যে-ঘুম ভাঙাও সে-ঘুম আমার রমণীয়।') তাই গীতাঞ্জলিতে আনন্দ ছাড়া কিছু নেই, দুঃখে আনন্দ, বঞ্চনায় আনন্দ, মৃত্যুও আনন্দময়। হয়তো সেই কারণেই সংগ্রামের চিহ্ন দেখতে ভুল হয়—কিংবা দেরি হয়।

আন্দ্রে জীদ তাঁর গীতাঞ্জলির ভূমিকায় বলেছেন যে এই কাব্যের তত্ত্ব-কথায় তিনি মজেননি, কেননা ঔপনিষদিক তত্ত্বের কোনো পরিবর্তনে কবি অনিচ্ছুক, অতএব তাতে নূতনত্ব নেই। কিন্তু এই পুরোনো তত্ত্বের আনন্দিত, সংরক্ত সঞ্জীবন, তার অভিনব শিল্পরূপের উজ্জ্বলতা—এরই প্রশংসায় জীদ পঞ্চমুখ। 'Passion', 'daring' (ইএটস-এর ভূমিকা), রবীন্দ্রনাথের পশ্চিমী গুণগানে যখন এ-সব কথা বার-বার শুনি, আমাদের তখন একটু অবাক লাগে। কিন্তু খৃষ্টীয় মতে যেহেতু তত্ত্বমসি অমান্য এবং জীবাত্মা পরমাত্মার ভেদবোধ প্রবল, তাই গীতাঞ্জলির অন্তরঙ্গতা পাশ্চাত্ত্য চোখে দুঃসাহসিক, তার উচ্ছল আনন্দ কারো কাছে দৃষ্য, কারো কাছে মহান।

এই আনন্দ কিসের? সে কি শুধুই ব্রহ্মস্বাদ, শুধু মায়ার পরপারে ধ্রুব সত্যের উন্মোচন? না, আনন্দ এই জীবনেও, এই মর্ত্য জীবনে, মৃত্যুকবলিত এই শরীরে, ইন্দ্রধনুতুল্য পৃথিবীতে। এই বোধ ভারতীয় ঐতিহ্যে যদিও সনাতন, তবু একদিকে 'রিনেসাঁস'-এর পুনরুত্থান, অন্য দিকে ব্রাহ্ম পিউরিটানিকতা, এই দুই আন্দোলনের প্রভাবে ভারতীয়রাও প্রায় ভুলতে বসেছিলো। রবীন্দ্রনাথ, শুধু-যে পুনর্বার ঘোষণা করলেন তা নয়;—যেহেতু তিনি প্রকৃতপক্ষে দার্শনিক নন, শিল্পী, ধর্মগুরু নন, কবি, তাই জন্মভূমিতেই তার নবজন্ম দিলেন। উপরন্তু, এই কথা বস্তুতই জগতবাসীকে শোনাবার যোগ্য, কেননা এই বৈরাগ্যব্যতীত মুক্তির প্রস্তাব, প্রচলিত ধর্মমতের যা বিরোধী, মানবের পীড়িত আত্মার মূল্যবান শুশ্রূষা এখানে নিহিত। এই পার্থিব জীবন, যে-সব অলঙ্ঘ্য বিধানের মধ্যে জীবের জন্ম, যার মধ্যে বাঁচতে এবং মরতে সে বাধ্য, সেটা যে ভগবানের উপলব্ধির অন্তরায় নয়, সেটাও উপায়, এই প্রয়োজনীয় চেতনা রবীন্দ্রনাথে যেমন ভাস্বর, তেমন আর কোন আধুনিক কবিতে?

বিশ্বের অণু-পরমাণুর সঙ্গে মানুষের ঐক্যবোধ আর কোন কবিতে এমন প্রবল? আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য যেখানে বহুলত নেতিবাদী, কখনো প্রায় অমানুষিক, কখনো প্রায় জীবনদ্বেষী, সেখানে—যদিও হিন্দুরাই মায়াবাদী ব'লে দুর্নাম—মর্ত্য জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রেম, বিশ্বাসের অঙ্গীকার রবীন্দ্রনাথেই পরিকীর্ণ। এই বিশ্বাসেই তাঁর চরম মূল্য। তাঁর কাব্য প'ড়ে নাস্তিক হয়তো শুভসম্পন্ন হবে না, কিন্তু—কার্যত সেটাই মূল্যবান—উদ্‌ভ্রান্ত আধুনিক মানুষের জীবন-বিশ্বাস ফিরতে পারে। সাম্প্রতিক পশ্চিমী সাহিত্যের মৃত্যু-পূজা আর বোধ হয় বেশিদিন সহ্য হবে না, বোধ হয় এলিঅটের ককটেল পার্টিতে এই শূন্যবাদ তার বিষণ্ণতম প্রান্তে পৌঁছলো। হয়তো এখনই পশ্চিমের নতুন ক'রে এই প্রাচ্য কবিতে প্রয়োজন।

অতএব ম্যাকমিলানের পুনর্মুদ্রণ সময়োচিত। আক্ষেপ শুধু এটুকু যে এই নতুন সংস্করণে 'দি চাইল্ড' নামক দুষ্প্রাপ্য কবিতাটি গৃহীত হ'তে পারলো না, এবং ইংরেজির সঙ্গে বাংলার কোনো উল্লেখ-সূচীর অভাবে সমালোচকের পরিশ্রম বাড়ে। এই সূচী বিশ্বভারতী স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করলে আমরা উপকৃত হই।

বুদ্ধদেব বসু

ওয়াল্টার ডে লা মেয়ার

সেখানে প্রখর সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না, শাদা বরফের উপর নিঃশব্দ তুষার ঝরে, পাণ্ডু চাঁদের আলোয় ডাইনী খরগোসের চোখ চিক্‌চিক ক'রে ওঠে। নিস্তব্ধ জনশূন্য বাড়ির দরজায় স্বদেশপ্রত্যাগত পথিক চকিত করাঘাতে নীরব গৃহের অধিবাসীর দেহোত্তর স্পর্শ পায়। এ-জগতে সবই সম্ভব। আধ-পাগলা মাসীপিসী নিরীহ মানুষকে ডাইনীর শক্তিতে শোষণ ক'রে নেয়। রেলগাড়িতে প্রৌঢ় ভদ্রলোকের অস্বস্তিকর কথোপকথনে হঠাৎ গা শিউরে উঠতে পারে। ক্রু-র মত অমন একটা জমজমাট রেলের স্টেশন কোন ডাইনীর ইশারায় ভয়ানকের হাতছানি দেয়।

এখানে বৈজ্ঞানিকের প্রখর দৃষ্টি ঝাপসা হতে বাধ্য। ধর্মগুরুরাও এখানে অস্বস্তি বোধ করবেন। যারা অশ্লীলাক্রমে নির্ভুল পা ফেলতে পারে তারা হয় শিশু, নয় আধপাগলা মানুষ। যে-জগতে স্বপ্ন বাস্তবের মতো সত্য, অথবা বাস্তবই স্বপ্নের মতো সত্য সে-জগতে তার্কিকের স্থান নেই। যেখানে বড়-বড় গির্জা আছে শুধু নীরবতার প্রতীক হয়ে, সেখানে তাদের প্রয়োজন শুধু নিঃসঙ্গ পথিককে অলৌকিক আকর্ষণে ভুলিয়ে নিয়ে আসা, অথবা অনুসন্ধিৎসু শিশুমনকে অকল্পিত ভীষণ পরিণতির দিকে টানা, সেখানে প্রচলিত ধর্মও স্তব্ধ। এখানে পদক্ষেপ করতে হবে ওয়াল্টার ডে লা মেয়ারের হাত ধ'রে।

ডে লা মেয়ারের মানস জগৎ সাধারণের আয়ত্তের বাইরে। Cranford, Barchester বা Five Towns আমাদের আশেপাশের গ্রামের মতোই পরিচিত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ডে লা মেয়ারের জগৎ তাঁর কাব্যবর্ণিত Lyonesse-এর মতো রহস্যাবৃত। সে-স্থান মাত্র একশো মাইলের মধ্যে হলেও অতি দুর্গম। এ-দেশে আমরা অঞ্জলি ভ'রে সূর্যকে উপভোগ করতে অভ্যস্ত, এই কবির প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় নেই। তাঁর দেশের শীতের নগ্ন শুভ্রতা, তার গ্রীষ্মের নিশ্ছিদ্র সবুজের স্তুতি অনেক কবি গেয়েছেন। সেই বর্ণ গন্ধ উপেক্ষা ক'রে তিনি প্রকৃতির লীলায় দেখেছেন

কুয়াশা, কাপসা চাঁদের আলো, অভিমান গোধূলি। আর এই পরিবেশে যারা ভিড় ক'রে আছে তারা নানা জাতের, নানা স্বভাবের পরী। আমাদের দেশের শুক্লপক্ষের চন্দ্রিমা ভয়নাশিনী, তারিণী, ভূতপ্রেত শাকচুন্নি (আমাদের দেশের মতো এত জাতের ভূত বোধ হয় আর কোথাও নেই) তারা সব চাঁদের আলোয় পালিয়ে যায়। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণকায় চাঁদও তাদের মনোমতো নয়। তাই আমাদের পরীরা, যারা শুধু চাঁদের আলোতেই মেলে আসে তারা সব ভালো, তারা সব ভালো-ভালো স্বপ্ন দেয়। যে-সব পরীর মতো মেয়েরা অরণ্যে ব'সে কেঁদে রাজকুমারদের ভুলিয়ে নিয়ে যায় তারা আসলে পরী নয়, ছদ্মবেশী ডাকিনী। বিদেশী সাহিত্যে দুষ্টু পরী, হিংসুটে পরী সবই ছিল। Yeats তো অনেক কেল্টিক পরীদের পুনরুজ্জীবিত করেছেন। কিন্তু ডে লা মেয়ারের পরীদের জাত আলাদা। বড়োরা পরীর সাহায্য নেয় ছেলে ভোলাতে, কিন্তু ডে লা মেয়ার শিশুর মন দিয়ে তাদের প্রত্যক্ষ করেন, তাই বাস্তবে আর স্বপ্নে যে-রেখা আমরা টানি তা তাঁর কাছে অগ্রাহ্য। তা ব'লে তিনি পৃথিবীর প্রতি উদাসীন নন। তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টির সামনে ক্ষুদ্রতম প্রাণীও নিঃসংকোচ। বিরাটের মহিমা তাঁর কাছে নেই, তিনি অতিক্ষুদ্রকেই উঁচু ক'রে ধরেছেন। Earwig যে প্রায় আমাদের কাছে কেঁচোর সামিল, তাঁকে তাঁর আগে কে দেখেছিল কাব্যে? ইঁদুর তো সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। মেনিবিড়ালের মুখে মানুষের ইতিহাসের যে-প্রহসনের বিবরণ দিয়েছেন, তা অত কম কথায় কোনো দার্শনিক বলেন নি। এই বিশ্বরূপ দেখে তিনি যখন বিশ্বস্রষ্টাকে স্মরণ করেন তখনও তাঁর মনে ভেসে আসে বালুর কণা, জলের বিন্দু। অনেক দিক থেকেই তাঁর পথ আমাদের অচেনা।

ভালো ভূতের গল্প ডে লা মেয়ারের তুলনায় অনেকে লিখেছেন। যা পড়ছি তা যে সত্যি নয় এ-কথা গল্প পড়ার সময় পাঠক সম্পূর্ণ বিস্মৃত হবেন, এই চেষ্টা অনেকেই করেছেন, কেউ-কেউ সফলও হয়েছেন। Eaton's Aunt-এর মতো উঁচুদরের ভূতের গল্প নিজের অজ্ঞাতসারেই লেখা হ'য়ে গেছে। স্বপ্নলোকে তাঁর নির্ভুল নিঃসংকোচ পদক্ষেপে আমরা বিস্মিত হই, কিন্তু তাঁর কাছে সেটা স্বাভাবিক, কেননা আমাদের শাদা চোখে যা দেখা যায় সেটাই

যে সম্পূর্ণ সত্য এ তো তিনি মেনে নেননি। অর্ধশতাব্দীব্যাপী সাহিত্য রচনায় গল্প উপন্যাসে, কাব্যে—তিনি যা সন্ধান করেছেন তা হ'লো যবনিকার আড়ালে সজ্ঞাগৃহের রূপ। তাই আপাতদৃষ্টিতে তাঁর সাহিত্যের প্রেক্ষাগৃহ অতি নিরাড়ম্বর, মফঃস্বলের শান্ত পরিবেশ, ভগ্ন গির্জা, জনশূন্য গৃহ। প্রকৃতিও হেমন্তের কুয়াশাচ্ছন্ন। আর এই পরিবেশে মানুষ যারা থাকে, তারাও অলস, নিষ্কর্মা, প্রাত্যহিক জগতে তারা অচল। কোনো কাজ নেই ব'লে তারা চিন্তার সময় পায় বেশি, আর তাদের আপাততুচ্ছ চিন্তাধারা আস্তে-আস্তে একে-বারে জীবনের মূলে গিয়ে স্পর্শ করে। তারা চিরকুমারী অথবা চিরকুমার, একটু অদ্ভুত, হয়তো বা একটু বিকৃতমস্তিষ্ক। তাঁর শিশুরাও বড়ো বেশি চিন্তাশীল। তাদের বড়ো বড়ো চোখে চাপল্য কম, তারা বেঁচে থাকে স্বপ্ন আর জাগরণের সেই সন্ধিস্থলে, যেটা তাদের স্রষ্টার কাছে "The actual realest on the verge of sleep।" তাই তারা সত্যদর্শী। পরস্ত্রীর প্রতি আসক্ত পুরুষের কাহিনী তো আমাদের বহুশ্রুত, কিন্তু এবার আমরা শিশুর মুখে তা শুনলাম। মূল তথ্য অনেক কিছুই জানলাম না, কিন্তু এই অপঘাতের মূল কোথায়, শিশুর চোখে তা ঠিক ধরা পড়লো। এক চিরকুমারীর বিকৃত মস্তিষ্কের গহ্বর থেকে অন্য এক শিশু তাঁর অতীতের প্রেমস্মৃতি উদ্ধার ক'রে ফেলল। এই সব অপ্রাপ্তবয়স্করাই ডে লা মেয়ারের সব চেয়ে বড়ো দার্শনিক। ছোটোর মোহ তাঁর এত বেশি যে একটি সম্পূর্ণ উপন্যাসের নায়িকার উচ্চতা দু'ফুটের বেশি নয়।

অনেকে আশঙ্কা ক'রেছিলো যে ডে লা মেয়ারের এই স্বপ্নবিহার ক্ষণস্থায়ী হবে, মৃদু সৌরভে খানিকটা তৃপ্তি এনে আরো অনেক ভাববিলাসী কাব্যের মতো মিলিয়ে যাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পঞ্চাশ বছরের সাহিত্য সৃষ্টির পরেও তাঁর প্রতি পাঠকসমাজের শ্রদ্ধা অক্ষুণ্ণ তো আছেই, বরং বেড়েছে। তিনি নিজে কোনোদিন নিজের প্রচারকার্যে যোগ দেন নি, তাই সব সময় মনে থাকে না আধুনিক সাহিত্যে তাঁর দান কতো বড়ো। তিনি জোর গলায় কোনো প্রচলিত মতের জয় ঘোষণা করেন নি, উনিশ শতকের বিরুদ্ধে খড়্গ উত্তোলন করেন নি, তাই অনেক সময় 'পলাতক' ব'লে তাঁর নিন্দা হয়েছে। কিন্তু যাঁরা এই অভিযোগ করেন, তাঁরা ভুলে যান যে প্রথম

মহাযুদ্ধের সময় তিনি রুপার্ট ব্রুকের মতো রণবন্দনার দামামা বাজান নি, কিন্তু উন্মাদনাহীন ক্লান্তিকর কর্মে যে অংশ নিয়েছিলেন, তার অবসর ভরে দিয়েছিলেন মধুসঞ্চয়নে। তাঁর বন্ধু Wilfred Gibson আজ তিরিশ বছর পরে সেই সব দিনের কথা স্মরণ ক'রে বলেছেন কেমন ক'রে যুদ্ধের অবসাদের মধ্যে কাব্যে, সাহিত্যে, সুন্দরে তাঁকে বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করেছিলেন কাব্যরচনায় নিযুক্ত ডে লা মেয়ার। তখন ডে লা মেয়ার র‍্যাশন সমিতির সভ্য। তাঁর এক সহকর্মীর সাক্ষ্যে আমরা জানলাম যে ও-কাজে তিনি খুব আনন্দ পেতেন, একঘেয়ে হিসেবপত্তরেও ক্লান্তি ছিলো না। তবে সরকারী জবানির বাঁধাধরা বুলিতে তাঁর সূক্ষ্ম কানে বড়ো আঘাত পেত। 'In the case of'—এর মতো সরকারী খাতায় প্রায় অপরিহার্য বাক্যগুলি পরিহার করতে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর এক সহকর্মী বলেছেন যে চিনির র‍্যাশন যখন আরম্ভ হ'লো তখন দেশের শত শত ব্যবসায়ী জানতেও পারলো না যে তারা যে সব ফর্ম এখানে ওখানে পাঠাচ্ছে, বিলি করছে, তাতে ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ কবির অনেকটা অংশ আছে। চিনির ব্যবসায়ীদের মতো আরো কত শত লোক জানলো না আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কতো অসুন্দরকে তিনি সুন্দর করেছেন। তাঁকে আকাশচারী ব'লে ত্যাগ করলে আমাদের পায়ের নীচের ক্ষেতই স্পষ্ট হবে, পদ্মের সন্ধান পাবো না, নিজেদের হৃদয়ও অনাবিষ্কৃত থেকে যাবে।

ডে লা মেয়ারের কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মিস্টিসিজম-এর বহুল আলোচনা আজকাল হচ্ছে। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু যে লঘু নয় এই প্রমাণ করার চেষ্টায় অনেক সমালোচক তাঁর প্রতীকিতা এবং রহস্যবাদের উপর বেশি জোর দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁর কাব্যের যথার্থ রসোপলব্ধির পক্ষে এ-সব প্রসঙ্গ অনেকটাই অবান্তর। কয়েকবছর পূর্বে প্রকাশিত "The Burning Glass" আর "The Traveller" কাব্য দুটির রূপকাংশ যদিও সুস্পষ্ট, তবু অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনার উপর অনাবশ্যক জোর দেওয়া হ'লে কাব্যরস উপেক্ষিত হবার আশঙ্কা থাকে। "The Traveller" এর মিস্টিক ব্যঞ্জনা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যেও মৌলিক নয়, আর আমাদের প্রাচ্য মনের কাছে এই যাত্রীর কোনোই নতুনত্ব নেই। কিন্তু আসল কথা এই যে কবি তাঁর যাত্রাপথে আমাদের

অচেতন মনের সুন্দরের দরজায় কড়া নেড়ে গিয়েছেন—যে-সুন্দর পার্থিব, ক্ষণস্থায়ী, শুধু তারই নয়, যা মৃত্যু পার হ'য়ে যায়, সেই অপরূপ সুন্দরেরও। আর তাছাড়া 'beauty vanishes, beauty passes, however rare it be"—তাঁর এই আক্ষেপ সব নশ্বর সৌন্দর্যেই প্রযোজ্য হ'লেও অবিনশ্বর সুষমা তাঁর কাব্যেই বন্দী হয়েছে—হয়তো, মিল্টন মায়ের মতো, শেক্সপীয়রের মতো, কেন না এর পরে মানুষ গান গাইতে ভুলে যাবে বলে মারে-র আশঙ্কা।

মৃত্যুর পরে সম্মানিত হওয়াই বোধ হয় অধিকাংশ কবির ভাগ্যলিপি কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে সাড়ম্বর মূর্তিপূজা না পেলেও তাদের আন্তরিক ভালবাসা তিনি পেয়েছেন। তাই তাঁর পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে তাঁকে অভিনন্দন জানাবার যে প্রস্তাব উত্থাপিত হল তাতে সাড়া দিলেন আধুনিক বহু সাহিত্যিক, কবি ও সমালোচক। কেউ কেউ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সবাই তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্ত। এঁরা নিজেদের রুচি অনুসারে কবিতায়, সমালোচনায়, স্মৃতিকথায় তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ফলে সংকলিত বইটি ডে লা মেয়ারের আগ্রহশীল পাঠকের কাছে মহামূল্য হয়েছে।

এ সংকলনের লেখকরা অনেকেই কবিকে যাত্রী বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি সেই পথের যাত্রী যে-পথে আমরা সকলেই চলেছি, 'hating the journey homeless home'। সুন্দর ভুবনের আকর্ষণ কাটানো কঠিন, তাই মৃত্যুও যে জীবনের যোগসূত্র মাত্র, বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, এ শিক্ষা আছে পৃথিবীর অনেক কাব্যে অনেক দর্শনে। মৃত্যুকে শান্ত সুস্মিত স্বরে ডে লা মেয়ারও আহ্বান করেছেন, কিন্তু আমরা পৃথিবীব্যাপী রণমত্ততার মৃত্যুর সেই মোহন রূপ আর দেখি না। প্রস্তুতির অবকাশ না দিয়ে যেখানে মৃত্যু আসে বীভৎসতম রূপে, যেখানে জীবনধারণের বিড়ম্বনায় লক্ষ-লক্ষ লোক জীবন হারাচ্ছে, সেখানে মরণ যে শ্যাম সমান নয় তা আমরা জানি। হুইটম্যানের 'Death serenely arriving arriving'ও মনে হয় প্রলাপবাক্য। কিন্তু তবুও ১৯৩০-৫০ দশকের মধ্যে কবিতা নতুন মোড় ঘুরেছে। এর আগের দশকের কবিদের স্পর্ধা দেখছি না, বরং পথ হাতড়ানোর প্রয়াস দেখছি। প্রচলিত ধর্মের দিকে অনেকে ঝুঁকছেন, আবার প্রাচীন লেখকদের কাছেও সংকেতের আশা করছেন কেউ কেউ। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে রণক্ষেত্রের উন্মত্ততার

ও স্থৈর্য আছে, আর আমাদের মানসিক রিক্ততা স্বাভাবিক বা চিরস্থায়ী তা হলে আমাদের ভীত ক্লান্ত শঙ্কিত যাত্রা পথে ডে লা মেয়ারের রচনা ই হবে।

ডে লা মেয়ার জন্মশতবার্ষিকীর এ-অভিনন্দনের সমালোচনা করব না, সে-প্রসঙ্গ নে অবান্তর। ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য এবং কবির হস্তাক্ষরের বিশ্লেষণ কে আরম্ভ ক'রে তাঁর রচনার মরমী সমালোচনা পর্যন্ত সবই এখানে আছে। মার মতো আরো অনেক পাঠকের এ বইটি হাতে পেলে আবার নতুন ক'রে ডে লা মেয়ারের পাতা ওল্টাতে ইচ্ছে করবে। টি. এস. এলিঅট তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলিতে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সাধারণকে অসাধারণ করেছেন ব'লে, স্বপ্ন আর জাগরণের পৃথিবীকে এক করেছেন ব'লে, নিরবয়ব শব্দ, গন্ধ, আলোকে সজীব বর্ণময় ক'রে তুলেছেন ব'লে।

> "By conscious art practised with natural ease
> By the delicate invisible web you wove,
> The inexplicable mystery of sound."

এ শুধু এলিঅটেরই স্বীকৃতি নয়, আমাদের আরো অনেকের।

অপর্ণা চক্রবর্তী

সমালোচনা

নীল আকাশ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : পূর্বাশা লিমিটেড, দেড় টাকা।

গদ্য যাঁরা ভালো লেখেন তাঁরা যে-পরিমাণে ভালো কবিতা লিখেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে ভালো গদ্য লিখেছেন কবিরা। অথচ এই বৈষম্যের যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কবিতা এবং গদ্য উভয় ক্ষেত্রেই একই রকম শব্দচেতনার প্রয়োজন, উভয় ক্ষেত্রেই রচয়িতাকে একই বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে কাজ করতে হয়। শব্দ, শব্দের ওজন, ধ্বনি, ব্যঞ্জনা প্রভৃতির দ্বন্দ্ব এক; কবিরই শিরঃপীড়া নয়, গদ্যশিল্পীরও। তবু কবিরা অভিজ্ঞতাকে যত সার্থকরূপে গদ্যরচনার ক্ষেত্রে প্রকাশ করতে পেরেছেন, লেখকেরা কবিতায় ততটা পারেন নি। কথাটা শুধু শব্দচেতনা নিয়ে হলে তাহলে তো ভালো লেখকমাত্রেরই গদ্যে পদ্যে সমান সিদ্ধি থাকত, জীবনানন্দ বা বিষ্ণু দের কথা উঠত না। আসলে গদ্য মন আর কবিমন স্বতন্ত্র বস্তু। গদ্যে কবিত্ব করা আর প্রকৃতই কবিতা লেখা, এ-দুয়ে অনেকটাই প্রভেদ। আবার গদ্যাকারে মনোভাব ব্যক্ত করা—এমন কি চিত্তহারী কাহিনী রচনা—এবং যথার্থই গদ্য নির্মাণ, এ-দুইও এক বস্তু নয়। রবীন্দ্রনাথের কথা ছেড়েই দিলাম, আধুনিক যুগেও কোনো-কোনো কবির গদ্যসিদ্ধি বিস্ময়কর। অপর পক্ষে, গদ্য লিখিয়ের দল—বিদ্যাসাগর থেকে আরম্ভ ক'রে সঞ্জীবচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ, অন্নদাশঙ্কর—হ্যাঁ, অন্নদাশঙ্করও—ছন্দে বন্ধে রচনায় এঁদের কাব্যে-কাব্যে যেটুকু বৈশিষ্ট্য, তা উৎকৃষ্ট পদ্যের সীমা ছাড়িয়ে বেশি দূর এগোয়নি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সাহিত্যে আবির্ভূত হলেন অসামান্য গদ্যকার নিয়ে; উনিশশো তিরিশের যুগে যে লিরিক গদ্যের চর্চা বহুল পরিমাণে হয়েছিল তার সূচনা অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' উপন্যাসেই। প্রথম যুগের অচিন্ত্যকুমার গীতল, কাব্যময়; উপন্যাস পড়ে মনে হত কাহিনীকবিতা পড়ছি। সে-ভাষা আজও বিস্ময়কর, আজও আধুনিক। কিন্তু 'অমাবস্যা' উল্লেখযোগ্য-রূপে প্রাচীনপন্থী। গদ্য লেখকের সঙ্গে কবির ব্যবধান অবিশ্বাস্য নিকট প্রকট। তবু, 'অমাবস্যা' ভালো লেগেছিল, কারণ বাংলা কবিতায় তখনও

মোহিতলালই নবাতম। তারপর গদ্যে এবং পদ্যে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গেছে; রবীন্দ্রনাথ উনিশশো একচল্লিশ সাল পর্যন্ত বেঁচে থেকে অনেক রকমের কবিতাই লিখে গেছেন, পরবর্তীরাও অনেকটা নতুনের জন্ম দিলেন। আজ আর নতুন ক'রে 'অমাবস্যা' লেখার দরকার করে না।

বাংলা গদ্যের পরিণতিতে অচিন্ত্যকুমারের দান বহুল, আজও পর্যন্ত সে-ক্ষেত্রে তাঁর পরীক্ষা থামেনি। কিন্তু কবিতায় কেন তাঁর কোনো পরীক্ষাই দেখলাম না? 'নীল আকাশ' ১৩৫৬ সালের বই বলে মনেই হয় না, ১৩৩৬ সালেই একে মানাতো ভালো। কবিতার কলাকৌশলে কিছুই নূতনত্ব নেই, ভাষাও সাবেকি ঢঙের। বিষয়ের দিক থেকেও বলা যেতে পারে 'প্রথমা'রই সমধর্মী, এমনকি 'প্রথমা'র প্রথমতো 'ভাই' শব্দের ছড়াছড়ি বিদ্যমান। বহুবার উদ্ধৃত 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতাটি ছাড়া ('আমি তো ছিলাম ঘুমে') 'নীল আকাশে' আমরা কী পেলাম? তাঁর মতো গদ্যলেখকের কাছে এ-প্রশ্ন উপস্থিত করা আশা করি ধৃষ্টতা ব'লে গণ্য হবে না।

নিরুপম চট্টোপাধ্যায়

প্রাপ্ত

The Crown and the Fable, A poetic sequence by **Hugo** Manning. Gaberbocchus Press Ltd., 6s.

To My Judges & other Poems, by Francesco Bivona, printed in the U. S. A. No price mentioned.

ভারতশিল্পে মূর্তি, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী। ৷৹

ছেলেভুলানো ছড়া, নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী সংকলিত। শান্তিনিকেতন পাঠভবন। ১৲

কবিতাভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯ থেকে বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৮১/৩, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ২৫, ওরিয়েন্ট প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ থেকে বিমলেন্দুভূষণ সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত।

পূজোর আগেই বের হবে

"কালো কবি"

—রচিত—

'খুসীর খেয়াল'

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের ব্যঙ্গ কবিতার বই

প্রকাশক : ওরিয়েন্ট প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং
হাউস লিমিটেড
৮১-৩, হরিশ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলকাতা-২৫

বিষ্ণু দে

নতুন কবিতার বই

'অস্বিষ্ট'

২৷৷০

দ্বিপদ	মৃণালকান্তি	১৷৷০
অতিকায়বসন্ত	অমিয় চক্রবর্ত্তী	১৷৷০
পদাতিক	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	১৲
একা	কামাক্ষীপ্রসাদ	২৲

কবিতাভবনে প্রাপ্তব্য

কবিতা

পুরোনো সংখ্যা

পরিবর্তিত তালিকা

১৩৪৪	পৌষ, চৈত্র
১৩৪৫	আষাঢ়, শ্রাবণ
১৩৪৬	আশ্বিন
১৩৪৮	আশ্বিন, কার্ত্তিক,
১৩৪৯	আশ্বিন, কার্ত্তিক
১৩৫০	আষাঢ়, শ্রাবণ,
১৩৫১	আষাঢ়

প্রতি সংখ্যা এক টাকা

সবগুলি একসঙ্গে ২৫৲ টাকা

[মাশুল স্বতন্ত্র]

সম্পূর্ণ সেট

একাদশ বর্ষ

দ্বাদশ বর্ষ

ত্রয়োদশ বর্ষ

চতুর্দশ বর্ষ

একাদশ ও দ্বাদশ একসঙ্গে

একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ একসঙ্গে

চার বছর একসঙ্গে